KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১৪, হাজরা স্ট্রীট
Collection : KLMLGK	Publisher :
Title : হাজরা স্ট্রীট	Size : 7" x 9" 17.78 x 22.86 c.m.
Vol. & Number : ১/৮	Year of Publication : অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ॥ Dec 1933
	Condition : Brittle Good
Editor : মণীন্দ্রমোহন মৌলিক সুধীরেন্দ্র জিবন কার্যালয়ী	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা সিটি ম্যাগাজিন লাইব্রেরী

১ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩৪০ | ৮ম সংখ্যা

আপনি কি এক সঙ্গে আপনার পরিবারপরিজনের ভবিষ্যতের সংস্থান
এবং সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে লগ্নি করিতে চান্ না ?

নিউ ইণ্ডিয়ার

আদর্শ স্বেচ্ছামূলক বেনিফিট পলিসি স্কীম্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ লগ্নি। এই স্কিমের
৫০০০৲ টাকার পলিসি ক্রয় করিলে ভবিষ্যতের জন্য ১৮,৬৯০৲
টাকার সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইল।

জীবন-বীমা, অগ্নি-বীমা, নৌ-বীমা, এবং দুর্ঘটনা
বীমা প্রভৃতি সকল প্রকার বীমা করা হয়।
পাঁচ কোটী টাকার অধিক দাবী পূরণ
করা হইয়াছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন—

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রতি সংখ্যা—।০ | অফিস—১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা | বার্ষিক মূল্য—৪॥০

"ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্" নিয়মাবলী

১। "ক্লাইভ ষ্ট্রীটের" বার্ষিক মূল্য (সডাক) তিন টাকা আট আনা। ষাণ্মাষিক মূল্য সডাক দুই টাকা দুই আনা, ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছয় আনা। মূল্যাদি "পরিচালক", "ক্লাইভ ষ্ট্রীট" ১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

২। বৈশাখ মাস হইতে "ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বর্ষ আরম্ভ হয়। বৈশাখ হইতে আশ্বিন ও কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ষাণ্মাসিক গ্রাহক হইবার নিয়ম।

৩। "ক্লাইভ ষ্ট্রীট" প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মাসের ৩০শে তারিখের মধ্যে সেই মাসের 'ক্লাইভ ষ্ট্রীট' না পাইলে অনুগ্রহ করিয়া স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন, ডাকঘরের তদন্তরের ফল আমাদিগকে পরবর্ত্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে না জানাইলে, উক্ত তারিখের পরে লিখিলে পুনরায় কাগজ পাঠাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

৪। জমা চাঁদা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকদিগের নিকট হইতে নিষেধ আজ্ঞা না থাকিলে পরবর্ত্তী সংখ্যা বার্ষিক গ্রাহকদিগকে বার্ষিক চাঁদার হিসাবে এবং ষাণ্মাসিক গ্রাহকদিগকে ষাণ্মাসিক চাঁদার হারে ভিঃ পিঃ করা হইবে।

মফস্বলের গ্রাহকদের পক্ষে মনিঅর্ডারে চাঁদা পাঠান সুবিধাজনক, খরচ কম হয়।

=প্রবন্ধাদি=

৫। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠি সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। উত্তরের জন্য ডাক টিকিট না পাঠাইলে সকল পত্রের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

৬। প্রবন্ধাদি হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী হইতে অক্ষম, সুতরাং লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নকল রাখিয়া প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। ফেরৎ পাঠাইবার ডাক টিকিট না থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি ফেরৎ পাঠান হয় না।

=বিজ্ঞাপন=

৭। বাংলা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তন আমাদের হস্তগত না হইলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তাহা দেওয়া হইবে না। কোন চলতি বিজ্ঞাপন ছাপা বন্ধ করিতে হইলেও উপরোক্ত তারিখের মধ্যে চিঠি আমাদের হস্তগত হওয়া উচিৎ। তাহা না হইলে সে বিষয়ে আমাদের কোন দায়িত্ব থাকিবেনা।

=মাসিক বিজ্ঞাপনের হার=

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—৩০৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১৬৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা—৯৲
ঐ ⅛ পৃষ্ঠা— ৫৲

বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য।

পরিচালক,—'ক্লাইভ ষ্ট্রীট'
১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

অগ্রহায়ণ—১৩৪০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। ছোট বহরে চিনির কারখানা	অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস	৩৬১
২। বাড়্‌তির পথে বাঙ্গালী	অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার	৩৬৬
৩। দেশের আশু প্রয়োজন কি ?	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭১
৪। কৃষি উপনিবেশের একটী পরি কল্পনা	শ্রীবনবিহারী বসু	৩৭৮
৫। ভারতীয় জীবন বীমার দিগ্‌দর্শনী	শ্রীসুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী	৩৮০
৬। আর্থিক দুর্য্যোগে আমেরিকা	শ্রীসুধাংশু রায়	৩৮৬
৭। বৈদেশিকী		৩৯৮
৮। ইয়ুরোপের পত্র	শ্রীচাণক্য	৩৯৪
৯। সংকলন — গৃহশিল্প		৩৯৭
জীবনবীমা ও সুদ		৩৯৯
এডেন ও নুন		৪০১
ভারতে চিনি		৪০৩
১০। সাহিত্যিকা	শ্রীমণি শর্ম্মা	৪০৬
১১। শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য		৪০৭
১২। ব্যবসা জগতে মনীষী	শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক	৪১০
১৩। সাংবাদিকা		৪১৬
১৪। সম্পাদকীয়		৪৩০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বীমা করিতে—

★ ষ্টার ★
ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া
★ ইণ্ডিয়া ★

ভুলিবেন না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য আজই পত্র লিখুন। ইহার ক্রমোন্নতি দেখিলে মুগ্ধ হইবেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর বোনাস্ দেওয়া হইয়াছে।

ব্রাঞ্চ অফিস্ ঃ—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯০৭)

এই উন্নতিশীল নির্ভরযোগ্য বীমা কোম্পানী সকল প্রকার আধুনিক জীবন বীমার ব্যবস্থা করিয়াছে।

প্রথম ভ্যালুয়েশন হইতেই ডিভিডেণ্ড দিতেছে। গত ভ্যালুয়েশনে শতকরা ১৫ টাকা ডিভিডেণ্ড দিয়াছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখিবেন।

হেড অফিস
১১, ব্যাঙ্ক ষ্ট্রীট
ফোর্ট, বম্বে।

সেন ব্রাদ্স এণ্ড কোং
বঙ্গদেশ, বেহার ও উড়িষ্যার চীফ্ এজেন্টস্
৪৪।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৮৯৬ সাল।

ভারতের সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বপুরাতন জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, লিঃ

নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলকে জীবনবীমার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

—সর্ব্বোচ্চ বোনাস—

আজীবন বীমা প্রতি হাজারে—২৫৲
মেয়াদী বীমা " ২১৲
উদ্বৃত্ত তহবিল (Accumulated Funds) ১,৪৬,০০,০০০৲

"ভারত ভবন"
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।
ফোন—কলিকাতা ২১০৩

এইচ, সি, চক্রবর্ত্তী
ম্যানেজার।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১/এম, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

ক্লাইভ ষ্ট্রীট

১ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩৪০ | ৮ম সংখ্যা

ছোট বহরে চিনির কারখানা

অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, বি, এস ; সি, এচ, ই (ইলিয়নয়)

অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস

আমাদের দেশে বহুকাল হইতে আঁকের চাষ প্রচলিত আছে। অনেকের বিশ্বাস এই ভারত-ভূমিতে সর্ব্বপ্রথম আঁকের উৎপত্তি হইয়াছিল। আমাদের দেশের বহু প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে চিনির (শর্করা) ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ আঁকের জন্মভূমি হইলেও আধুনিক যুগে আমাদের আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত চিনি বিদেশ হইতে আমদানী হয়। গোটা ভারতবর্ষে বাৎসরিক ১০,০০,০০০ টন চিনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বঙ্গদেশ প্রায় ৫,০০,০০০ টন চিনি ব্যবহার করে। আমাদের দেশে যে চিনি আমদানি হয় তাহার অধিকাংশই জাভা হইতে আসিয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর যে চিনি বিদেশ হইতে আমদানি হয় তাহার মূল্য প্রায় ২০ কোটী টাকা। ইহার অর্দ্ধেকই বাঙ্গালা দেশের লোক বহন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে দুনিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষেই আঁকের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে হাওয়াই দ্বীপ, কিউবা ও জাভা আঁকের চাষে ভারতবর্ষকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া জাভা প্রভৃতি দ্বীপে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে আঁকের চাষ আবাদ হয় এবং সারের প্রয়োগ হয়। সেইজন্য এই সকল স্থানে বিঘা প্রতি আঁক ভারতবর্ষ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ উৎপন্ন হয়। তারপর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আজকাল নূতন নূতন রকমের আঁকের বড় কারখানায়

গাছের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই সকল গাছে বেশী পরিমাণ চিনি থাকে। এই জাতীয় নূতন আকের প্রচলন আমাদের দেশেও ক্রমশঃ হইতেছে। তার পর আজকাল অনেক উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে আক হইতে রস বাহির ও রস হইতে চিনি তৈয়ার করা হইয়া থাকে। এই সকল উন্নত আধুনিক প্রণালীর ও যন্ত্রাদির সাহায্যে বিঘা প্রতি চিনি জাভা প্রভৃতি দ্বীপে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাভায় বিঘা প্রতি প্রায় ৪০ মণ চিনি হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে বিঘা প্রতি গড়ে ১৫।২০ মণের বেশী চিনি হয় না।

আজকাল নূতন রকমের আকের গাছের প্রবর্ত্তন হওয়ায় ভারতবর্ষে বিঘা প্রতি আক বেশী জন্মাইতেছে এবং তাহাতে বিঘা প্রতি চিনিও বেশী পাওয়া যাইতেছে। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে চিনি তৈয়ার করিলে আরও বেশী চিনি পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা দেশে যে আক উৎপন্ন হয় তাহাতে চিনির পরিমাণ বেশী থাকে। কাজেই বাঙ্গালা দেশে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বিঘা প্রতি বেশী চিনি উৎপন্ন হইবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশের লোক যত চিনি বৎসরে খাইয়া থাকেন বঙ্গদেশের লোক একাই সেই পরিমাণ চিনি খাইয়া থাকেন। অতএব বলা বাহুল্য যে ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশেই চিনির কারখানা খুলিবার উপযুক্ত স্থল। বর্ত্তমান বিদেশী চিনির উপর যে শুল্ক বসিয়াছে তাহার সাহায্য লইয়া মাড়োয়ারী ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ধনীরা বিহার, U.P. পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে অনেক চিনির কারখানা খুলিয়া চিনি প্রস্তুত করিতেছেন এবং এই ব্যবসায় প্রচুর লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা চিনির কারবারে বেশী লাভ থাকা স্বত্ত্বেও একটীও চিনির কারখানা বাঙ্গালীর মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হইল না। এখনও যদি বাঙ্গালী ধনীদের চোখ না ফোটে তাহা হইলে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অন্ধকার।

বিদেশী চিনির উপর ১৫ বৎসরের জন্য শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কাজেই এই ১৫ বৎসর চিনির ব্যবসায় যথেষ্ট লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৫ বৎসর পরে শুল্ক উঠিয়া গেলে বিদেশী চিনির প্রতিযোগীতায় দেশী চিনিকে দাঁড়াইতে হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আকের চাষ ও আধুনিক উন্নত প্রণালীতে আক হইতে চিনি উৎপাদন করিতে হইবে। অর্থাৎ বিঘা প্রতি আক বেশী জন্মাইতে হইবে এবং আকের মধ্যে যাহাতে বেশী চিনি থাকে তাহা ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা না করিতে পারিলে প্রতিযোগীতায় আমাদের দেশী চিনি কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিবে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতবর্ষের ধনীরা যাঁহারা চিনির ব্যবসায় লাখ লাখ টাকা ফেলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে এখন হইতে চিন্তা করিতে হইবে। আশা করি তাঁহারা ইহার সমাধান করিতে পারিবেন এবং ভারতবর্ষের চিনির ব্যবসাকে চিরদিনের জন্য শক্ত ভিত্তিতে স্থাপন করিতে পারিবেন ভবিষ্যতে যেন বিদেশী চিনি আর ভারতবর্ষে আসিতে না পারে।

আজকাল চিনির কারবারে লাভ করিতে হইলে একটী কারখানার capacity দৈনিক ৫০০টন হওয়া উচিত; অর্থাৎ এই কারখানায় ২৪ ঘণ্টায় ৫০০ টন আক নিষ্পেষিত হওয়া দরকার এবং তাহা হইতে যে রস পাওয়া যাইবে তাহা চিনিতে পরিবর্ত্তিত করিবার উপযোগী সাজ সরঞ্জাম থাকা দরকার। এইরূপ কারখানা (৫০০টন) স্থাপন করিতে ১০ হইতে৩১৫ লক্ষ টাকা মূলধন দরকার। বিদেশী চিনির উপর শুল্ক স্থাপনের পর আমাদের দেশে যে সকল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই capacity ৫০০ টন। কয়েকটী কারখানার capacity ৫০০ টনের বেশী আছে আর কতকগুলির capacity ৫০০ টনের কম। ৫০০ টনের কমের কারখানাগুলি শেষ পর্য্যন্ত প্রতিযোগীতায় দাঁড়াইতে পারিবে কিনা সন্দেহ জনক।

এখন ১০।১৫ লক্ষ টাকা মূলধন তোলা বাঙ্গালা দেশে একরকম অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। এবং সেই জন্যই আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালী একটীও বড় চিনির কারখানা স্থাপন করিতে পারে নাই। এ অবস্থায় ছোট ছোট চিনির কারখানা অর্থাৎ দৈনিক ১টন অথবা ½ টন চিনি তৈয়ার করিবার কারখানা স্থাপন করা উচিত কি না এই বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে।

এই সকল আলোচনার ফলে—দেখা যাইতেছে যে, এই জাতীয় ছোট কারখানায় যথেষ্ট লাভের আশা আছে। বাঙ্গালাদেশে এই জাতীয় অনেকগুলি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং যতদূর জানা যাইতেছে ভালভাবে চলিতেছে। এই জাতীয় ছোট কারখানায় অনেকগুলি সুবিধা আছে যাহা

নাই। যথা এই সকল ছোট কারখানা মফঃস্বলের যে কোন স্থানে যেখানে আকের চাষ হয় স্থাপন করা যাইতে পারে এবং স্থানীয় হাটবাজারে তৈয়ারি চিনি ভাল দামে বিক্রী হইতে পারে। রেলওয়ের ভাড়া বাঁচিয়া যায় ও তাহা লাভ বৃদ্ধি করে। দরকার মত ছোট কারখানা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে ও সহজেই স্থাপন করা যাইতে পারে। দেশী চিনি বলিয়া স্থানীয় বাজারে চাহিদা বেশী হয় ও দামও বেশী পাওয়া যায়। আকের দামও কম দিতে হয়। এই সকল ছোট কারখানা একটু ভাল ভাবে সুদক্ষ লোক লইয়া চালাইতে পারিলে বেশ সাদা চিনি তৈয়ার করিতে পারা যায় এবং মণ করা চিনি তৈয়ার করিবার খরচ এক হইতে দুই টাকার বেশী হয় না। মূলধনও কম লাগে যাহা বাঙ্গালাদেশের অনেকে ফেলিতে পারে এবং বলাবাহুল্য এই মূলধনের উপর যথেষ্ট লাভ হয়। বাঙ্গালাদেশে এই প্রকারের শত শত কল স্থাপিত হইতে পারে এবং তাহারা বহুলোকের উপজীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা হইবে। বড় মিলের প্রতিযোগিতায় ছোট মিল-গুলিকে ফেল করিতে পারিবে না। বাঙ্গালী বাঙ্গালাদেশে চিনি তৈয়ার করিবার এক নূতনযুগ আনয়ন করিতে পারিবেন।

এইরূপ চিনির কারখানা সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। এইরূপ কারখানায় নাম (Open Pan System) ভালভাবে লাভ করিতে হইলে ইহার capacity দৈনিক একটন হওয়া উচিত অর্থাৎ দৈনিক এক টন চিনি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। কারখানার আয়তন (size) এক টনের কম হইলে ভাল লাভ হইবে না। দৈনিক এক টন চিনি প্রস্তুত করিতে যে যন্ত্রপাতি দরকার হইবে তাহার দাম দশ হাজার টাকার বেশী হইবে না। তারপর কারখানা চালাইবার জন্য আরও পাঁচ হাজার টাকা মূলধন লাগিবে। মোট পনর হাজার টাকা ফেলিতে পারিলে, কারখানা বেশ চলিবে। এই প্রণালীতে (process) চিনি তৈয়ার করিলে ১৪ মণ আক হইতে এক মণ চিনি প্রস্তুত হইবে। আকের দাম চারি আনা মণ ধরিলে ১৪ মনের দাম ৩॥০ টাকা হইবে। চিনি প্রস্তুত করিবার খরচ সব ধরিয়া চিনির মণ করা ১।০ টাকার বেশী হওয়া উচিত নহে। অতএব প্রতি মণ চিনি প্রস্তুত করিতে মোট ৪৸০ খরচ পড়িবে। খুব বেশী হইলে ৫৲ টাকার বেশী হইবে না। বাঙ্গলা দেশের অনেক জায়গায় আক ৶০ মণ পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে খরচ আরও কম পড়িবে। বিহারের ও বাঙ্গলা-দেশের অনেক জায়গায় ৶০ মণ হিসাবে আক পাওয়া যায়। চিনির দর নিশ্চয়ই ১০৲ টাকা মণের কম নহে। প্রস্তুত-কারক চিনি ৮৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিলেও মণকরা তিন টাকা লাভ থাকিবে। দৈনিক এক টন চিনি প্রস্তুত করিলে দৈনিক ৮০৲ টাকার উপর লাভ থাকিবে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর লাভের ব্যবসা আর কি আছে? কারখানা ১০০ দিন চালাইলে ৮০০০৲ টাকা লাভ থাকিবে। ১২০ দিন পর্য্যন্ত কারখানা চালান যায়। আক শেষ হইয়া গেলে উপরোক্ত কারখানার সহজেই গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে। তজ্জন্য আর কোন সরঞ্জাম কিনিতে হইবে না। গুড় যদি সস্তায় পাওয়া যায় ও সস্তার বাজারে কিনিয়া রাখা যায় (Stock) তাহা হইলে গুড় হইতে চিনি তৈয়ার করিয়াও যথেষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।

বঙ্গদেশে বাৎসরিক যত চিনি দরকার হয় তাহা তৈয়ার করিতে শত শত এক টনের কারখানা বসাইতে হইবে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই প্রকার কারখানার (erection) যন্ত্রপাতি করান উচিত তাহা না করিলে যথাসময়ে কারখানা তৈয়ারী হইবে না। আর দেরীতে কাজ আরম্ভ করিলে লাভও কম হইবে।

বঙ্গদেশে এই বৎসর বিস্তর নূতন জমির উপর আকের চাষ হইয়াছে। কিন্তু চিনির কোন কারখানা না থাকায় এই আক উপযুক্ত দামে বিক্রী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং তজ্জন্য কৃষকদের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। এ অবস্থায় কৃষকদের আক হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে গুড়ের উৎপাদন খুব বেশী হইবে এবং সেই জন্য গুড়ের দামও কমিয়া যাইবে। গুড় প্রস্তুত করিতে কৃষকদের মণ করা যাহা খরচ পড়ে, বিক্রী করিয়া তাহাও উঠিয়া আসে কিনা সন্দেহ। গুড় প্রস্তুত করিয়া কদাচিৎ কৃষকেরা আকের চাষে লাভবান হইতে পারে। আক হইতে চিনি প্রস্তুত করাই লাভ করিবার একমাত্র উপায়। আর আক হইতে যাহাতে বেশী পরিমাণ চিনি পাওয়া যায় এবং চিনির রং সাদা হয় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। কাজেই ছোট চিনির কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বঙ্গদেশের

কৃষকদের বিশেষ উপকার হইবে। কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে বাঙ্গালীজাতির অবস্থা ফিরিবে।

দৈনিক ৩০ মণ গুড় তৈয়ারীর হিসাবে দৈনিক ২০ ঘণ্টা কাজের খরচ

১। ইঞ্জিনের জন্য

১টী ড্রাইভার মিস্ত্রি ১।০ হিসাবে	১।০
১২ গ্যালন জ্বালানী তেল, ।৶০ গ্যালন হিসাবে	৫।০
কলের তেল ½ গ্যালন ২৲ টাকা গ্যালন হিসাবে	১৲
বাজে জিনিষাদির জন্য	॥০

২। মিলের জন্য

মিল খাটাইবার কুলী ৩জন ।৶০ দিন হিসাবে	১৶০
২টী ছোকরা ।০ আনা দিন হিসাবে	॥০
বাজে জিনিষাদির জন্য	॥০

৩। চুল্লীর জন্য

ভার প্রাপ্ত লোক একজন ॥০ আনা দিন হিসাবে	॥০
৭টী কুলি ।৶০ আনা দিন হিসাবে	২॥৶০
২টী ছোক্‌রা ।০ আনা দিন হিসাবে	॥০
চুল্লীর অতিরিক্ত সময়ের জন্য খরচ	১৸৶০
৪। আক (১০ মণ আকে ১ মণ গুড় ধরিয়া ৩০০ মণ আকের প্রয়োজন) ৪০০ মণ ।০ আনা মণ হিসাবে	১০০৲
৫। ১০% ডিপ্রিসিয়েসন্ (১০,০০০৲ টাকা ৪ মাসে অর্থাৎ ১২০ কার্য্যকরী দিন হিসাবে	৯॥/৪
৬। ১০,০০০ টাকায় ১০% ডিপ্রিসিয়েসনে শতকরা ১০% সুদ ধরিয়া	৯॥/৪
৭। মেরামতী ও সংস্কার (১০০৲ টাকায়)	।৶০

বৎসরে ২২০ দিনের কার্য্যোপযোগী একটী একটন চিনির কলের পরিকল্পনা

	টাকা	আনা	পাই
১টী ১৮।২১ খনিজ তৈল চালিত ইঞ্জিন	৩,০০০	০	০
১টী আধুনিক "পিটারসন-রেনওয়িক" আকের কল	৮০০	০	০
১টী ঘণ্টায় দুই মণের চুল্লী	৮৫০	০	০
১টী ২৪ "সেন্ট্রিফুগাল"	১,৫৫০	০	০
১টী পাগ্‌মিল (ডবল বিটার)	৬৩০	০	০
ইঞ্জিন স্থাপন	২৫০	০	০
মিল স্থাপন	৮০	০	০
"সেন্ট্রিফিউগাল" স্থাপন	১১০	০	০
"পাগ্‌ মিল" স্থাপন	৫০	০	০
৩২' ৩ স্ক্যাফ্‌টিং	৯৬	০	০
৪টী প্লাম্বার ব্লক	৮০	০	০
উপরোক্ত ৪টীর জন্য ব্রেকেট্‌ সি, আই	৬০	০	০
বেল্টিং	১২০	০	০
স্ক্যাফ্‌টিং এর ৪টী কলার	৩০	০	০
শুল্ক, বোঝাই খরচ ইত্যাদি	২০০	০	০
কলকব্জা প্রভৃতি বসাইবার খরচ	২৫০	০	০
স্ক্যাফ্‌টিং ও চাবির খুলি	১৫০	০	০
স্কিমার, ব্রাস্‌ প্রভৃতি	৫০	০	০
ছাউনী	১,০০০	০	০
গুড় প্রভৃতির বাঁধান আধার	৫০০	০	০
বিবিধ	১৪৪	০	০
মোট	১০,০০০	০	০
৮। দৈনিক পাহারা খরচ		১৲	
৯। দৈনিক বিবিধ খরচ		॥০	
১০। পরিদর্শন ও আফিস বাবৎ দৈনিক		২৲	
মোট		১৩৮॥৶৮	

উপরোক্ত গুড় চিনিতে পরিবর্ত্তিত করিতে

১। "সেন্ট্রিফিউগালের" জন্য

"সেন্ট্রিফিউগালের" জন্য ২টী কুলী দিন ।৶০ আনা হিসাবে	৸০
"সেন্ট্রিফিউগাল" চালাইবার জন্য ।৶০ হিসাবে দিন একটী কুলী	।৶০
দৈনিক ।৶০ হিসাবে একটী কুলী চিনি শুকাইবার জন্য	।৶০

২। "পাগ্‌মিলের" জন্য

পাগ্‌মিল ভর্ত্তি করিবার জন্য ও "সেন্ট্রিফিউগাল" হইতে গুড় সরাইবার জন্য ।৶০ আনা হিসাবে দুইটী কুলী	৸০
"সেন্ট্রিফিউগাল" ও "পাগ মিলের" জন্য ঘুচরা	॥০
"স্ক্যাফ্‌টিং" এর জন্য ঘুচ্‌রা ষ্টোর	॥০
মেরামতী কাজ	॥০
বিবিধ	॥০
মোট	১১।০

৩। চিনি ভর্ত্তি করিবার খরচ

২৮টী এক মণ ওজনের গানি ব্যাগ ।০ আনা হিসাবে	৭৲
মোট	১১।০
সর্ব্ব সাকুল্যে প্রায়	১৫০৲
২৮ মণ চিনি তৈয়ারীর মোট খরচ	১৫০৲
১ মণ চিনি তৈয়ারীর মোট খরচ (১৫০৲ ÷ ২৮) প্রায়	৫।৶০

দৈনিক গুড় হইতে ½ টন চিনি তৈয়ারীর কল চালাইবার খরচ

কেরোসিন তেলের ইঞ্জিন—৩ এচ্‌, পি	২৫০৲
"পাগ্‌ মিল" সহ "সেন্ট্রিফিউগাল"	৪০০৲
২ সেটের বয়লিং প্যান	৫০৲
হাতল, খুন্তী প্রভৃতি	১৫৲
মাটির পাত্র	১৫৲
গ্রিণ্ডার	১২৫৲
কল বসাইবার খরচ	১০০৲
রেলওয়ে শুল্ক	৫০৲
মোট	১০০৫৲

২ মণ গুড় ১ মণ চিনি উৎপাদন করিবে। গুড়ের দাম ২৲ টাকা করিয়া মণ।

১ মণ চিনি তৈয়ারীর উপযুক্ত গুড়ের মূল্য	৪৲
১ মণ চিনি তৈয়ারীর খরচ	১৲
মোট	৫৲

এই মিলটী সারা বৎসর খাটান যাইতে পারে।

বাড়্‌তির পথে বাঙ্গালী

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

বাংলার লোক সংখ্যা যে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে ইহা আজ আমার বলিবার বিষয় নহে। আর আমি এই বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের এবং ধনের বা সুদীর্ঘ-জীবনের এবং উপার্জ্জন-ক্ষমতার বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। সেই প্রকার শিক্ষায়, সাহিত্যে সর্ব্বপ্রকার গঠনীয় গবেষণায়, সামাজিক কর্ম্মে এবং রাজনীতিতে যে বাঙ্গালী আজ উন্নতর পথে অগ্রসর হইতেছে ইহাও আমার বক্তব্যের বিষয় নহে।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

যে বাঙ্গালীর উন্নতি আজ সকলের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে সেই উন্নতি আজ নূতন ব্যাপারের ও বিশেষত্বের উদ্ভাবনে এবং নূতন গুণাবলীর যোগ্যতার মাঝেও দেখিতে পাই। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে আমার আলোচনা হিন্দুদের বিশেষতঃ বর্ণ হিন্দুদের মধ্যেই সন্নিবদ্ধ থাকিবে।

বাঙ্গালী হিন্দুর শিল্পে ও বানিজ্যে উন্নতি

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র যখন "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত রচনা করিতেছিলেন এবং ভারতীয় জাতীয় মহাসভার স্থাপন যখন ধীরে ধীরে হইতেছিল, তখন আধুনিক পন্থায় শিল্পের এবং বানিজ্যের অনুষ্ঠানকারী ব্যবসায়ী হিসাবে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা বোধ হয় অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করা যাইত। আজ বাংলার হিন্দু উপাদান-শিল্পবিদ্যায় সুসজ্জিত এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে বিমণ্ডিত শিল্পীর এবং ব্যবসায়ী সমাবেশে—একটি ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। যাহাদের নাম শিল্প ও বানিজ্যের জগতে প্রবাদের মত হইয়া রহিয়াছে সেই সাহা, তিলী, গন্ধবণিক এবং সুবর্ণবণিক যে শুধু আজ ব্যবসা বানিজ্য দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে তাহা নহে; আজ তথাকথিত শিক্ষিত ও উচ্চবর্ণের বাঙ্গালী হিন্দুগণও শিল্প ও বানিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

আধুনিক ব্যবসায়ে বর্ণ হিন্দুগণ

আজ বাংলার কায়স্থগণের মধ্যে সকলেই শুধু কলম-চালান কেরানী নহে, সকল বৈদ্যই হামানদিস্তার কবিরাজ নহে এবং সমস্ত ব্রাহ্মণই কেবল মাত্র পুরোহিত বা রন্ধনের ব্রাহ্মণই নয়। আবার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ সম্প্রদায়-গুলিও বর্ত্তমানে কেবল মাত্র বা প্রধানতঃ স্কুল শিক্ষক, উকিল এবং চিকিৎসক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নয়, এই যুগের বাংলার শিক্ষিত ভদ্রলোক বা বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে শত শত, শুধু শত শতই বা বলি কেন সহস্র সহস্র লোক—শিল্পী, ফ্যাক্টারীর কর্ম্মকর্ত্তা মিলের ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নিক, কন্ট্রাক্টার, বাসের মালিক, আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায়ী, জাহাজ ইত্যাদির মালিক, বিমান বীর, ব্যাঙ্কের কর্ম্ম-কর্ত্তা, ইনস্যুরেন্সের এজেন্ট, ছাপাকর, শিল্প বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, ফিল্ম ব্যবসায়ী, পুস্তক প্রকাশক, সংবাদপত্র সেবী; ইহা ব্যতীত আরও অনেক

ব্যবসা আছে যাহাতে তাহারা ক্রমশঃ ঢুকিয়া পড়িতেছে। বর্ণ হিন্দুদের জীবন যাপনের ভাব-স্রোত আজ শুধু ওকালতী এবং অধ্যাপনার খাতে প্রবাহিত হয় না, বরং ব্যবসায়ী, শিল্পী এবং কল-কারখানার ম্যানেজারগণই আজ হিন্দু জীবনের ভাব-স্রোতকে প্রবাহিত করিতেছে।

নূতন ব্যবসায়ে বাঙ্গালী চরিত্রের পরিবর্ত্তন

বাংলার লোক সংখ্যা গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে শতকরা মাত্র ৩৮ জন বাড়িয়াছে। অর্থাৎ লোক সংখ্যা ৩ কোটী ৭ লক্ষ হইতে ৫ কোটী ১০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যে সমস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দু আজ শিল্প, আমদানী, রপ্তানী, ব্যাঙ্কিং এবং ইনসিউরেন্স প্রভৃতি ব্যবসাগুলি আকড়াইয়া ধরিয়াছে —যাহারা আজ আর্থিক এবং ব্যবসায়িক কার্য্যে নূতন পথগুলি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা শতকরায় বাড়িয়া গিয়াছে। আজ তাহাদের সংখ্যা অসংখ্য। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নূতন ভাবে প্রণোদিত হইয়া জীবন কাটাই-বার এবং জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম হেতু তাহাদের চরিত্র আজ ক্রমশঃ সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। যে প্রকারে বাঙ্গালী বর্ণ হিন্দুগণ ব্যবসা এবং বানিজ্যকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন তাহার তুলনা অতীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে না; এমনি কি উনবিংশ শতাব্দীতেও তাহার তুলনা পাওয়া দুর্ল্লভ। রাজা রামমোহন রায়ের কথা বলিতে চাহিনা—কবিকঙ্কন চণ্ডীর প্রণেতার কথা বলিতে চাই না; সেদিনকার লেখক বঙ্কিমও যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বোধ হয় তিনিও আমাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারিতেন না।

যুব-বাংলার কৃতিত্ব

আজ যে শিল্প, ব্যবসায়ে এবং বানিজ্যে বাঙ্গালীর মগজ এবং পরিচালনা শক্তি এত প্রবল ভাবে দেখা যাইতেছে মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তাহা একপ্রকার অজ্ঞাত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যে সময় হইতে স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫) বাংলার গৌরব ছটাকে জগতে ছড়াইয়া দিয়াছে, সেই সময় হইতেই এই সকল ব্যবসা এবং জীবন প্রণালীর পথ, নবীন বাংলার উদ্যমপূর্ণ অথচ দুঃসাহসিক বীরেরা খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। বর্ত্তমান এসিয়াতে সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে যুবক বাংলার কৃতিত্বে যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য জনক বিষয় তাহা নিঃসন্দেহ এবং এই জন্যই ইহা প্রাচ্যের সামাজিক বিপ্লবের একটি প্রধান অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।

নূতন ভাবের লোক

নূতন ভাবে প্রণোদিত বাঙ্গালীদের মধ্যে মিহির সেন এবং ক্ষিতি সেন গুপ্তের নাম উল্লেখ যোগ্য। মিহির সেন "ওরিএন্টাল্ ডাইয়ার এণ্ড প্রিনার স্থাপন করিয়াছেন, ক্ষিতি সেন মৎস্য এবং ও কৃষিকার্য্যে চেষ্টা করিতেছেন এবং বর্ত্তমানে ইক্ষু বপনের ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন। চারুগুহ (জার্ম্মান-ফেরত) একজন সুবিখ্যাত ফটো আর্টিষ্ট্। নিরঞ্জন পাল (বিলেত ফেরত) ড্রামাটিক্ এণ্ড পাবলিসিটি ফিলিম্ এণ্ড কোম্পানীর এবং পি, মুখার্জ্জী পাঞ্জাবের জাতীয় বানিজ্য সভার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

বরিশালের যতীন দত্ত সেয়ার বিক্রয়ের ব্যবসা করিয়া থাকেন। মালদহের মন্মথ দে (জাপান-ফেরত) ভাগলপুরের সিল্ক ইনষ্টিটিউট্ পরিচালনা করিয়া থাকেন। অনাথ সরকারের (আমেরিকা ফেরত) "বেঙ্গল ক্যানিং কোম্পানী" খুবই জনপ্রিয়; রাজসাহীর অখিল চক্রবর্ত্তী টিউব্ ওয়েলের কার্য্যে দক্ষ; খগেন মিত্র আবার শাক সব্জীর বাগানের কাজ করিয়া থাকেন, ইহারা উভয়েই আমেরিকা ফেরত।

বরিশালের কাষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং কণ্ট্রাক্টার যতীন চক্রবর্ত্তী, "গনেশ রাইস মিলের" মালিক চারু ঘোষ, (বিলাত ফেরৎ) কলিকাতার বহু তেলের কলের মালিক হৃষিকেশ লাহা ইহাদের নাম অতি সুপরিচিত। ঢাকার জি, ঘোষের তিলে তৈলের খ্যাতি সমগ্র বঙ্গে ব্যাপ্ত।

সুপ্রসিদ্ধ নামগুলি

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির ব্যবসায়ী হিসাবে বঙ্গ সমাজের ডাক্তার কার্ত্তিক বসুর যথার্থ প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি বাস্তবিক আচার্য্য প্রফুল্ল রায়ের মত বাঙ্গালী রসায়ন শিল্পের একজন প্রতিষ্ঠাতা। সেই প্রকার সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী হিসাবে ইনস্যুরেন্স পরিচালক অবিনাশ সেনের (কুমিল্লা) খ্যাতি ও যশঃ আমাদের দেশে যথেষ্ট রহিয়াছে। বড়

ব্যবসার মালীক, পরিচালক এবং ম্যানেজার হিসাবে আমাদের দেশে মৈমনসিংহের সতীশচন্দ্র চৌধুরী এবং ফরিদপুরের সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাহারা যে বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল, সিলং মোটর সার্ভিস্, অমৃতসরের উল্‌ন ম্যানুফ্যাক্চারীং কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন ইহা সর্ব্বজন পরিচিত। যাহাদের প্রেমচাঁদ পাটের কল এবং জাহাজ কোম্পানী বাঙ্গালীর প্রতিভাকে আরও বিশেষ ভাবে বিকাশ লাভ করিবার সহায়তা করিয়াছে—সেই ভাগ্যকুলের রায়দের খ্যাতি আজ শুধু বঙ্গদেশে নয়, সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত।

ব্যবসায়ে জমিদারগণ

জমিদারগণও তাহাদের ব্যবসা বানিজ্যের যোগ্যতা দেখাইতেছেন। গৌরীপুরের (মৈমনসিং) জমীদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, দিঘাপাতিয়ার (রাজসাহী) কুমার শরৎ রায়, কলিকাতার লাহা বংশ, টেপার (রংপুর) নলিনী রায় চৌধুরী, ভাগ্যকুলের রায়েরা (ঢাকা), তারাসের (পাবনা) রাধিকা রায়, চৌগাঁয়ের (রাজসাহী) রমণী রায়, নড়াইলের (যশোর) ভবেন রায়, শ্রীরামপুরের তুলসী গোস্বামী, ঢাকার রমনাথ দাস ইহারা যে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ের অংশীদার তাহা নহে, ইহারা এই সব ব্যবসায়ের ম্যানেজার এবং পরিচালক। ইহাদের কার্য্য কৃষিউদ্যান পশুপক্ষীপালন প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া খনি, ব্যাঙ্কিং, ইনস্যুরেন্স এবং ছাপাখানা।

তুলার এবং হোসিয়ারী মিলের ম্যানেজার

এই যে বঙ্গলক্ষ্মী, বঙ্গেশ্বরী, বঙ্গোদয়, বরিশাল, চট্টগ্রাম, চিত্তরঞ্জন, ঢাকেশ্বরী, ইষ্টইণ্ডিয়া, যতীন্দ্রমোহন, লক্ষ্মীনারায়ণ, মোহিনী, প্রফুল্লচন্দ্র ইত্যাদি প্রায় ১৮টী কাপড়ের কল উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হইতেছে, ইহার জন্যও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর মগজ দায়ী। ঢাকার রামনাথ দাস, মৈমনসিংহের অখিল গুহ, পাবনার জিতেন রায়, মৌড়ীর মানব কুণ্ডু, বরিশালের অধ্যাপক অতুল সেন, কুষ্টিয়ার গিরিজা চক্রবর্ত্তী এবং অন্যান্য আরও সকলে তাহাদের সুগভীর অভিজ্ঞতার দ্বারা বঙ্গলা জাতিকে ধনী করিয়াছেন, শুধু তাই নয়, ইহা ছাড়া প্রায় ১৮টী হোসিয়ারী মিল বাঙ্গালীর দ্বারা কলিকাতায়, পাবনায় এবং অন্যান্য স্থানে পরিচালিত হইতেছে।

কয়লার খনিতে এবং চা বাগানে ব্যবসায়ী

পশ্চিম-বঙ্গের বহু লোক কয়লার খনিতে এবং কয়লার ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন। বাঁকুড়ার বিজয় চাট্টোপাধ্যায়—যিনি পূর্ব্বে বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য ছিলেন তিনি একজন সুদক্ষ কয়লা ব্যবসায়ী। বেলগাছিয়ার সুশীল ঘোষ এবং সত্যকিঙ্কর ব্যানার্জ্জি, উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, রায় বাহাদুর হরিপদ এবং অবিনাশ ব্যানার্জ্জি—ইহারা সকলেই কয়লার ব্যবসার সহিত জড়িত আছেন। তদ্রূপ চা'র ব্যবসায়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালীগণ নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই ব্যবসায়ে যোগেশ ঘোষ, তারিনী রায়, অধ্যাপক যোগেশ মিত্র, সতীশ রায়, শান্তিনিধান রায় এবং আরও সকলে বিশেষ প্রতিপত্তি করিয়া লইয়াছেন।

প্রস্তুত কারক

নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত কারক হিসাবে ধীরেন সাহা (যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষিত) এবং মধুসূদন মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্লাসগো এবং আমেরিকা হইতে প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আসিয়া তাহারা ক্লাইড ফ্যান এবং মোটর ব্যাটারী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব বাংলায় কুমিল্লাতে যে "হাউস অফ লেবারাস" নামক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে তাহার খ্যাতি পূর্ব্ব-বাংলায় ঘোষিত হইয়াছে। দিয়াশলাইএর ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ পি, সি, রায়, ইলেকট্রিট বাল্‌ব্ এবং ক্যানভাস বেল্টিং প্রস্তুত কারক জিতেন গাঙ্গুলী (আমেরিকা ফেরত) ফাউন্টেন পেন প্রস্তুত কারক অমর দাস, এফ্, এন্, গুপ্ত—ইহাদের নাম অতি সুপরিচিত। ডালহৌসী স্কোয়ারের "বেঙ্গল আইস ক্রিম্ ম্যানুফ্যাক্চারীং কোং" কলিকাতায় অতি জনপ্রিয় হইয়া পড়িতেছে। বেঙ্গল ইমিউনিটির সহিত ক্যাপটেন্ নরেন দত্ত যে বিশেষ জড়িত তাহা অনেকেই অবগত আছেন। শত শত ক্ষুদ্র শিল্প বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর প্রতিভায় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

মেকানিক্যাল ইলেকট্রীকাল এবং কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ার

ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় (জার্ম্মান ফেরত) পি, সি, মুখার্জ্জি এবং আরও অনেক আমেরিকা-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার কলিকাতার আন্তর্জাতিক মোটর ও টায়ার কোম্পানী পরিচালনা

করিতেছেন। তদ্রূপ বসু গ্রেটইণ্ডিয়ান মোটর ওয়ার্ক্সের পরিচালনা করিতেছেন। সুরেন বসু (আমেরিকা ফেরত) টাটা লৌহ এবং ষ্টীল কোম্পানীর ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যক্ষ। ঐ কোম্পানীতে ফরিদপুর নিবাসী নরেন সেনও (আমেরিকা ফেরত) মেকানিকাল ইলেকট্রিক বিভাগে বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষিত বহু ইঞ্জিনিয়ার টাটা কোম্পানীতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। দেবেন চৌধুরী এবং বঙ্কিম রায় (উভয়েই বিলেত ফেরত) ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহাদের একজন মাদ্রাজ নগরে এবং অপরজন কলিকাতা কর্পোরেশনের গ্যাস বিভাগের সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট। সতীশ মিত্র, রসিক দত্ত, আদিনাথ সেন, করুনা গুহ ইহারা বৈদ্যুতিক এবং রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

রসায়নাগার প্রভৃতির স্থাপন কর্ত্তা

এস্থলে বেঙ্গল কেমিকালের নাম উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ সমগ্র ভারতে এমন লোক খুব কমই আছেন যিনি বিশ্বস্ত বেঙ্গল কেমিকালের নাম অবগত নহেন। ডাক্তার অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের কুমিল্লার শিল্প রসায়নিক বিজ্ঞানাগারে এসিড্, ঔষধ এবং নানাপ্রকার দেশীয় গাছড়া হইতে ভেষজ তৈরী হইয়া থাকে। বরিশালের জ্ঞানেন্দ্র দাশ গুপ্তের (আমেরিকা ফেরত) এসিয়া কেমিকাল ওয়ার্ক্স ও এই সব বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করিতেছে। খগেন দাস গুপ্ত (আমেরিকা ফেরত) ক্যালকাটা কেমিকাল ম্যানুফ্যাক্চারীতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতার সহিত সাবান, দন্ত-মঞ্জন, সুগন্ধি তেল ঔষধ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন।

মিস্ত্রী এবং কন্‌ট্রাক্টার

কলিকাতার আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিস্ত্রী, কন্‌ট্রাক্টার এবং ইঞ্জিনিয়ারও বাড়িয়া গিয়াছে। যতীন ব্যানার্জ্জি, অমিয় সান্যাল, নগেন সেনগুপ্ত প্রভৃতির নাম আমরা প্রতিদিন কলিকাতার রাস্তায় দেখিতে পাইতেছি। বার্ড কোম্পানীর রাইমোহন ব্যানার্জ্জি ব্রীজের এবং কংক্রীট ও ইটের কার্য্যে বিশেষজ্ঞ।

আমদানী ও রপ্তানীর ব্যবসায়ী

ঢাকার বীরেন দাস গুপ্ত (আমেরিকা ও জার্ম্মান ফেরত) প্রাচ্য মহাদেশের সঙ্গে রপ্তানি বানিজ্যে প্রথম পথ প্রদর্শক। এ বিষয়ে তিনি তাহার অংশীদার যতীন হ'ই (পাবনায় বাড়ী) এবং সতীশ দাস গুপ্ত ইত্যাদির নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া থাকেন। তাহাদের ইণ্ডোস্থইস ট্রেডিং কোম্পানীর শাখা ভারতের বিভিন্ন নগরে রহিয়াছে এবং তাহাদের একটি ভিন্ন অফিস হামবার্গে রহিয়াছে। প্রাচ্য মহাদেশের সহিত আমদানী ব্যবসায়ী হিসাবে শরৎ দত্ত (জার্ম্মান ফেরত) পথ প্রদর্শক। কুমিল্লার মহেশ ভট্টাচার্য্যের রসায়ন দ্রব্যাদির আমদানী ব্যবসায়ী হিসাবে বেশ নাম আছে। বটকৃষ্ণ পালের নাম ত বাংলার ঘরে ঘরে সুপরিচিত। ফরিদপুরের মনোরঞ্জন ঘোষ আন্তর্জাতিক ইলেকট্রিক কোম্পানীর ম্যানেজার।

যান বাহন কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব

যান বাহন ব্যাপারেও বাঙ্গালীর মাথা অন্য দিক হইতে কম খাটিতেছে না। বাঙ্গালী বাস কোম্পানীর মালীক এবং ম্যানেজার আমরা প্রতি জেলায় দেখিতে পাই। সুধীর রায়ের কলিকাতার মোটর বাস এবং ভট্টাচার্য্য কোম্পানীর শিলংএ মোটর সার্ভিস দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়। ভাগ্যকুলের রায়েরা অনেক দিন যাবৎ পূর্ব্ব-বাংলায় ষ্টীমার সার্ভিস্ চালাইতেছেন। ইণ্ডো-সুইস্ ট্রেডিং কোম্পানীর বঙ্গীয় জলযান সমিতি কলিকাতা হইতে হুগলী পর্য্যন্ত পারাপার করিয়া থাকে। অল্প দিন হয় এন্, কে, রায় চৌধুরী কোম্পানী কলিকাতা এবং পূর্ব্ব বাংলার মধ্যে মাল বহনের জন্য বেঙ্গল ষ্টীমার সার্ভিস করিয়াছেন। যে সমস্ত ব্যক্তি বিদেশে যায় তাহাদের সুবিধার জন্য সুধাংশু মিত্র কলিকাতায় একটি কোম্পানী খুলিয়াছেন এবং বিশ্বের সামুদ্রিক পথে বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার

নগরের এবং মফঃস্বলের প্রায় ৮ শত বা ৯ শত লোণ আফিসে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যুবকগণ নিযুক্ত রহিয়াছেন। ম্যানেজারদিগের মধ্যে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের হীরালাল সেনগুপ্ত কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যোগেশ সেন (আমেরিকা ফেরত)

কলিকাতা ফিনান্স কোম্পানীর অমিতাভ ঘোষ (আমেরিকা ফেরত) এবং বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যতীশ দাসের নাম উল্লেখযোগ্য রহিয়াছে। জেলার ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনের ভার বগুড়ার ললিত সান্যাল দিনাজপুরের যোগেন চক্রবর্ত্তী, পাবনার পাকরাশী, চট্টগ্রামের ত্রিপুরা চৌধুরী এবং মোহিনীদাস ; কুমিল্লার ইন্দুভূষণ এবং নোয়াখালীর ক্ষেত্র দালাল প্রভৃতির ন্যায় করিত কর্ম্মী লোকের উপর।

ইন্‌সিওরেন্স পরিচালক

যিনি ব্যাঙ্কিং এবং সমবায়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যাহার ব্যবসা প্রতিভা যুক্তপ্রদেশ এবং বেহারের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে সেই পান্নালাল ব্যানার্জ্জিও বাংলাদেশে ইনসিওরেন্সে বিভাগের প্রথম পথ প্রদর্শক ছিলেন। বহু বাঙ্গালী বহু অ-বাঙ্গালীর ইনসিওরেন্সের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, যথা—অবিনাশ সেন, সুরেন গুপ্ত, জ্ঞান ঘোষ দস্তিদার, ইন্দু সেন, ডাক্তার সুরেশ রায়, অধ্যাপক হেমন্ত সরকার, মনি দত্ত। বর্ত্তমানে আজমীরের জেনারেল অ্যান্সুরেন্স সোসাইটির ম্যানেজার বিনোদ রায়।

যে সমস্ত বাঙ্গালী বঙ্গীয় ইনসুরেন্স কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সত্যেন ব্যানার্জ্জি, যোগেশ ঘোষ, নলিনী রায় চৌধুরী, গিরিজা সান্যাল, করুণা কর, অধ্যাপক নলিনাক্ষ সান্যালের নাম উল্লেখ যোগ্য। অল্প দিন হয় শ্রীলোকেরাও এই ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়াছে। আজ অম্বিকা উকিলের বন্ধু সুরেন ঠাকুর এবং নলিনীরঞ্জন সরকার নাম সর্ব্বজন বিদিত।

ছাপাকর এবং প্রকাশক

আজ বাঙ্গালীর বহু ছাপাখানাও রহিয়াছে। চিন্তামনি ঘোষের ইণ্ডিয়ান প্রেস (এলাহাবাদ, বেনারস এবং কলিকাতা) সুরেশ মজুমদারের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস এবং অনিল দের কলিকাতা ট্রেডিং কোং, আর্ট প্রেস্ প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। প্রকাশকের কাজ গুরুদাস চাটার্য্যি এণ্ড সন্স, বসুমতী পাবলিসিং হাউস, এস-কে লাহিড়ী, চক্রবর্ত্তী চাটার্য্যি, এন, এম রায় চৌধুরী, বুক কোম্পানী, কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল বুক এজেন্সি প্রভৃতি করিতেছে।

সমাচার লেখক

বাঙ্গালী সমাচার-লেখক কেশব রায় অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের একজন প্রতিষ্ঠাতা। কুমিল্লার বিধু সেনগুপ্ত ইউনাইটেড্ প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার অনেক সুবিখ্যাত ব্যক্তি সংবাদ-পত্রের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে হরিশ মুখার্জ্জি, শিশির কুমার এবং মতিলাল ঘোষ, সুরেন ব্যানার্জ্জির নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আজও অমৃত বাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠাতার বংশ-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বসুমতীও তদ্রূপ। এ ব্যবসায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী আইন ব্যবসা ছাড়িয়াছিলেন। গত বিশ বৎসর হইল হেম নাগ এই ব্যবসায়েই নিযুক্ত রহিয়াছেন। সত্যেন মজুমদার (আনন্দবাজার) কিশোরী ব্যানার্জ্জি (ইণ্ডাষ্ট্রি) ক্ষেত্রপাল ঘোষ (কলিকাতার কমারশিয়াল গেজেট) প্রভৃতি আরও অনেকে সংবাদ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন।

বাঙ্গালীর জয় করিবার ইচ্ছা

যে সমস্ত ব্যক্তি বা যে সমস্ত ব্যবসা আজ জগতে পথ প্রদর্শকের কাজ করিতেছে তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা ছাড়া আমাদিগের মনে রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য যে যে-সমস্ত বাঙ্গালী এই সব শিল্পে ও বাণিজ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন তাহারা সকলেই লক্ষপতি হন নাই। আবার ইহা যেন আমরা মনে না করি যে তাহাদের প্রত্যেকের জীবনই অবিচ্ছিন্ন কৃতকার্য্যতার দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে। এই পথে বাধা আছে শত শত, সুযোগ আছে নিতান্ত অল্প, আর দারিদ্র্য আছে সার্ব্বজনীন ভাবে। কিন্তু এই সকল নূতন পথ উদ্ভাবনের সময়মাত্রই দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইবার সময়। তাঁহারা অকৃতকার্য্য হওয়া সত্ত্বেও যে চেষ্টা হইতে বিরত হন না—বরং এই সকল কার্য্যে লাগিয়া থাকেন ইহাই তাহাদের কৃতিত্ব। আজ তাহাদের কর্ত্তৃক যে সহস্র সহস্র শিল্প বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন একটি অসীম সাহসিক যুদ্ধ চলিতেছে, আর সে যুদ্ধের উদ্দেশ্য —শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও নূতন পথকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকা এবং বাঙ্গালী জাতির জয় করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বাঙ্গালী যুবকগণ যে প্রকার অভাব, কষ্ট, এবং আশাহীনতার ভিতর কার্য্য করিবার চেষ্টা এবং আকড়াইয়া ধরিবার শক্তি দেখাইয়াছেন তাহাপেক্ষা কোন জার্ম্মাণ, জাপানী বা আমেরিকার যুবক বেশী চেষ্টা ও শক্তি দেখাইতে পারেন নাই। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের কথা বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে শিল্পে, বাণিজ্যে, জ্ঞানে এবং পরিচালন-শক্তিতে তাহারা বর্ত্তমান যুবক হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এরূপ লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কেবল এই বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা আরম্ভ করা হইয়াছে কিন্তু এই পথ বড়ই সুদীর্ঘ এবং একঘেয়ে। বাঙ্গালী আজ পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্ন থাকিলেও এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। যুবকবাংলার বীরত্বব্যঞ্জক ও দুঃসাহসিক কার্য্যে রত হইবার চেষ্টা কখন বিফল হইবে না ; বরং ইহা শিল্প ও বাণিজ্যের রাজ্যে এক নূতন যুগান্তর আনয়ন করিবে।

দেশের আশু প্রয়োজন কি ?

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"আজ বাঙ্গালী অধঃপতিত, ক্রমঅধঃগামী ; বাঙ্গালায় বেকার সমস্যা দিন দিন প্রবলতর, বাঙ্গালার অর্থ লুট হইতেছে" —ইত্যাদি কথা শুনিয়া আমরা যে কেবল ব্যথিত ও দুশ্চিন্তা তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছি, এবং গভীর বৈরাগ্য, অসন্তোষ ইত্যাদি মানসিক বিকৃতি যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেরই মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। পাশ্চাত্য জগৎ হইতে আমদানী নূতন নূতন ভাবধারা, অর্থনীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি সকল স্থান কাল-পাত্র ও অবস্থা না বুঝিয়া এদেশে চালাইবার চেষ্টা হওয়ায় দেশের ব্যবসায়ীগণ ভীত ও ত্রাস্ত হইয়া পড়িতেছে ; রাজনীতি চর্চ্চা বিঘ্ন-বহুল হওয়ায় নূতন নেতার দল অপেক্ষাকৃত বিঘ্নশূন্য অর্থ ও বাণিজ্য-নীতি লইয়া হস্ত ও কণ্ঠ কণ্ডুয়নের নিবৃত্তি করিতেছেন ; ফলে আমরা ঘর সামলাইতে যাইয়া বেসামাল হইয়া পড়িতেছি। সেই অবসরে সুবিধাবাদীর দল নিজেদের ব্যক্তি ও সম্প্রদায়গত সুবিধা এবং 'ফাঁকের ঘরে' নাম ও অর্থ দুইই করিয়া লইতেছে। যাহাতে নাম ও অর্থ সমাগমের সুবিধা নাই এবং অর্থব্যয় করিয়া অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে বা অপরের খ্যাতি বৃদ্ধি হইবে সেরূপ কার্য্যে ইঁহারা একান্ত নারাজ।

মানুষ যখন দুঃখ ও কষ্টের কবলে পড়ে, তখন বন্ধু, স্বজন, প্রতিবেশী তাহার মন হইতে দুঃখের ভাবনা দূর করিতে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে যাহাতে সে আরও মনমরা এবং নিরাশ না হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য নানাবিধ উচ্চাশা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কর্ম্মপন্থার ব্যবস্থা করে কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের লেখক, নেতা, বক্তা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ঠিক ইহার বিপরীত ব্যবস্থা করিতেছেন, ফলে "উল্টা বুঝিলি রাম" হইতেছে! কথায় কথায় সমালোচনার ফোয়ারা বা মোৎফরক্কা উপদেশ দিলেই কর্ত্তব্যের অবসান হয় না। সুখের বিষয় এখন চতুর্দ্দিকে দুঃখ-পীড়িত লোকদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার একটা ইচ্ছা দেখা যাইতেছে কিন্তু যত্ন, চেষ্টা, সাহায্য ও সুপরিচালনার অভাবে এই সকল চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতেছে। তথাকথিত প্রগতি-ইচ্ছুক ভবঘুরের দল এই সুযোগে ঠকবাজী ও প্রবঞ্চনা করিয়া যুবকগণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নিজেদের দিন গুজরান করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্য্য সকল ফলপ্রসূ হইতে পারিতেছে না।

নানাদিক হইতে মাত্র কয়েকটি "মোটা কথা" শুনিতে পাই ; কথাগুলো যখন দশের মুখ হইতে শুনা যায়, তখন সেগুলির মধ্যে যে কতকটা সত্য নিহিত আছে তাহা অস্বীকার করিতে পারি না এবং কোনও চিন্তাশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা অস্বীকার করিবেন না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমি অনেকের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবং কয়েকটি বিষয়ে একমতও হইয়াছি যে আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কতকগুলি ত্রুটি ও দোষ সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিয়াছে যাহার মূলোচ্ছেদ আশু আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সে সব কথা উদাহরণ দিয়া প্রকাশ করিলে জাতির গৌরব বাড়িবে না কিন্তু প্রকাশ না করিলেও ক্ষতস্থানে প্লেপ-ঔষধ পড়িবে না, অথচ সে সকল কথা প্রকাশ্যে আলোচনা করিলে ভারতের অন্য সম্প্রদায়ের নিকট আমরা আরও ঘৃণিত এবং হীনপ্রতিপন্ন হইব ; তবে উপায় কি ? উপায় আছে, কিন্তু অবলম্বন

করিবে কে এবং উহা অবলম্বন করাইবে কে? পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত প্রত্যেক দল যদি আপোষে উহার মীমাংসার চেষ্টা করে তবেই উন্নতি সম্ভব; ব্যবসা-জগতে বা দোকানদারী কার্য্যে কেন যে আমরা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছি তাহার কিছু ইঙ্গিত আমি ইতঃপূর্ব্বে করিয়াছি, কিন্তু স্বাজাত্যভিমানী এক শ্রেণীর লোক তজ্জন্য অন্য লোকের স্বজাতি-সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধার প্রতি শুধু কটাক্ষপাত নহে হস্তক্ষেপও করিতে অগ্রসর হন। এরূপ মনোবৃত্তি যে নিন্দনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা সত্যের আলোক সহ্য করিতে পারেন না, সেজন্য কি বাক্য বা লেখনী বন্ধ করিতে হইবে?

আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার সম্বন্ধে দোকানদার মহল হইতে কয়েকটি ব্যবহারের নমুনা দিলেই যথেষ্ট হইবে, আশা করি কেহ ইহা ব্যক্তিগত ইঙ্গিত বলিয়া মনে করিবেন না।

বাঙ্গালী দোকানদার বাঙ্গালী শিল্পীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন না, শিল্পীর অর্থকৃচ্ছ্রতা ও মাল কাটাইবার গরজের উপর তাহারা যথেষ্ট অন্যায় অত্যাচার করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর কারখানার জিনিষ হাজার ভাল ও সস্তা হইলেও তাহারা বাঙ্গালীর জিনিষের দাম আরও কমাইয়া থাকে এবং মাল কাটাইবার কোনও চেষ্টা করে না; মাল কাটিলেও তাহার মূল্য দিতে কারখানা-ওয়ালার "রক্ত মোক্ষণ" করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারাই বিলাতী বা অন্য প্রদেশের মাল কাটাইতে, উচ্চ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে এবং কড়ার মাফিক টাকা দিতে সবিশেষ যত্নবান। ইহা কি সত্য কথা নহে? অথচ, যদি কারখানাওয়ালা ধনী এবং জবরদস্ত লোক হন তাহা হইলে সেখানে নগদ মূল্য জমা দিয়া মাল লইয়া আসিতে সেই লোকই সতত প্রস্তুত। যে জিনিষের নাম ও চাহিদা আছে, এবং লাভ নাম-মাত্র, সেরূপ জিনিষ লইতে, কাটাইতে এবং কড়ার মত দাম দিতেও তাহারা আদৌ অমনোযোগী নহে। এরূপ স্থলে নূতন বাঙ্গালী কারখানার কারবার চলিবে কিরূপে? কি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কি মুরগীহাটা, কি কলুটোলা বা এজরা ষ্ট্রীট সর্ব্বত্র বাঙ্গালী দোকানদারের বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগ। এমন ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান ধনী-কারবারী ঐ সকল অঞ্চলে আছেন যাঁহারা বিলাত, জার্ম্মানী হইতে ৬০।৯০ দিনের দাম দিবার কড়ারে মাল পাইয়া থাকেন কিন্তু মুরগীহাটা বা কলুটোলার দোকানদার তাঁহাদিগকে এক দিনের ধারে বা কড়ারে এক পয়সারও মাল ছাড়েননা। কেন? এ ব্যবহারের কারণ কি এবং দোষ কোথায় বা কাহার? এই কলিকাতায় এমন বাঙ্গালী কারবারী ও দোকানদার আছেন যাঁহারা ধারে মাল দিলেও লন না, এবং বাজার দরের নীচে মাল বেচেন না; সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কারবারীও আছেন; ইঁহারা কড়ারে মাল লইলে একদিনের জন্য কড়ার খেলাপ করেন না; কিন্তু সাধারণতঃ কড়ার খেলাপী দলই সংখ্যায় অত্যধিক।

ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা এককালে বাঙ্গালীর একচেটিয়া কারবার ছিল; আজ সেই কারবার অন্য প্রদেশীয় লোকদের হাতে চলিয়া যাইতেছে কেন, কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? এই বাজারেই জেটীসরকার হইতে লোকে মস্ত বড় ধনী এবং বহু বিদেশী লৌহ ব্যবসায়ীর সোলএজেন্ট হইয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, এমন ব্যবসায়ীর অভাব ছিল না; এখনও ২।৪ ঘর এমন লোক আছেন; টাটা কোম্পানীর প্রচলিত কার্য্য-পদ্ধতি আরম্ভ হওয়ার সময় বাঙ্গালীই উহাদের সেলিং ও সোল এজেন্ট হইয়া কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু আজ তাঁহারা হীনভ্রষ্ট হইল কেন? কি আশায় প্রলুব্ধ হইয়া **বাঙ্গালী খরিদ্দারকে মাল বেচিবার জন্য মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া ব্যাপারী এবং দালাল নিযুক্ত হইল?** শুধুই কি প্রাদেশিক প্রীতির জন্য ইহা ঘটিয়াছে, না আরও কিছু? ভাটিয়া ও মাড়োয়ারী দালাল এবং ব্যবসায়ীগণ যেরূপ কষ্ট ও ঝুঁকি সহ্য করিয়া মাল কাটাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, বাঙ্গালী কারবারী কি তদ্রূপ করিতে যত্নবান হন? বাঙ্গালী মুৎসুদ্দীগণই বা স্বানচ্যুত হইল কেন? অ-বাঙ্গালী বা মাড়োয়ারী-ধনী মুৎসুদ্দি হইয়া যে ভাবে মাল কাটাইতে যত্নবান হইতেন বাঙ্গালী মুৎসুদ্দিরা কি তদ্রূপ যত্ন ও চেষ্টা করিতেন? তখন মুৎসুদ্দী বলিলেই অলস ধনাভিমানী ধনীকে বুঝাইত, ক্রমে ইহা একটী অকর্ম্মার বিশেষণ রূপে ব্যবহার হইত। অন্য প্রদেশবাসী যদি অসাধুতার আশ্রয়ে এই সকল পদলাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে পদ কয়দিন তাহারা অধিকার করিয়া থাকিবে? দুই-এক স্থলে অসাধুতা সাফল্যলাভ করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু

স্থানচ্যুত পক্ষ প্রকৃত সাধু উপায়ে কি ঐ সব অনাচার বন্ধ করিতে পারিতেন না? অর্থ ও ব্যবসা-ব্যাপার এতই জটীল ও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত যে একটিকে আকর্ষণ করিলে অপরটিও আকর্ষিত হইবে। সুতরাং ব্যবসা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ বা পুঁথি-গত বিদ্যা-সাহায্যে বিজ্ঞ হওয়া যাইবে না। বাজারে এমন ব্যবসাদার দেখিয়াছি যাহারা পুরুষানুক্রমে সোনা-রূপার ব্যবসাদার হইয়াও সোনা-রূপার দর উঠে-পড়ে কেন তাহা জানেন না। এটা **পুঁথিগত** বিদ্যার সামিল বলিয়া কি ঐ সকল ব্যাপারী বা দোকানদার এ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানলাভ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করে না? বাঙ্গালী শিক্ষিত দোকানদারদের মহলে এত জ্ঞানাভাব যাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং শুনিলে সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পার্শী, ভাটিয়া ও মাড়োয়ারী ব্যাপারীদের ১২।১৪ বয়স্ক ছেলেরা ব্যবসা সম্বন্ধে পিতা, ভ্রাতা, খুল্লতাত ইত্যাদির মুখে মুখে যে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে অনেক প্রবীণ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীও সে সকল সংবাদ জানা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। আবার আধুনিক শিক্ষিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে আত্মাভিমান ও বিদ্যাগৌরব এতই প্রবল যে তাঁহারা অন্যের কথা কাণে তোলেন না, বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহারা একেবারে প্রকাণ্ড অজ্ঞ। কেহ কোন বাক্তি সফলকাম না হইলে কৃতী-লোকের বিরুদ্ধে জুয়াচোর, উৎকোচ-দাতা ইত্যাদি কতক সত্য, কতক কাল্পনিক অভিযোগ উপস্থিত করিয়া নিজের ত্রুটী-বিচ্যুতির কথাটা ঢাকিয়া দেয়। মোটের উপর সাধুতা অপেক্ষা সাধুতার ভানটা অতিমাত্রায় চলিয়াছে; তাহার উপর আছে বড় বড় কথা যাহা তাহাদের রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই। বিলাতফেরৎ "বিশেষজ্ঞ" দলে এই ভাবটা খুব প্রবল; এই দলকে কারবারীরা সতত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। এই দলের মধ্যে এমন সব নাম-কাটা সিপাহী আছেন, যাঁহাদের জন্য এই দল "মার্কা-মারা" জুয়াচোর বলিয়া অখ্যাত হইয়াছেন; হাট-কোটধারী দেখিলে এবং বিলাত-ফেরৎ শুনিলে ব্যবসাদার ইঁহাদের দূর হইতে নমস্কার করিয়া থাকেন।

এমন দোকানদার দেখিয়াছি যিনি ২০।২৫ বৎসর পৈত্রিক কারবার চালাইবার পর বিলাত গিয়া এমন সাহেব হইয়া আসিয়াছেন যে দোকানে পূর্ব্বের ন্যায় ধুতি চাদর পরিয়া বসা অব্যবসায়িত্ব বলিয়া মনে করেন। স্বজাতীয়া ধুতি চাদর পরিয়া তাঁহাদের কাছে যাইতে ভয় পায়।

বাঙ্গালী দোকানদারগণ ইচ্ছা করিলে সাধু উপায়ে বাঙ্গালার শিল্পকারখানাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিতেন—শিল্পী ও কারখানাওয়ালারাও যদি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হইতেন এবং নিজের সামর্থ্য ও শক্তিমত কাজ করিয়া, নিজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতেন তাহা হইলেও কাজ আরও কতকটা আগাইয়া যাইত, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাবে অনেক কারখানাওয়ালাকে অকালে চলতি ও উঠতি কারবার বন্ধ করিতে হইয়াছে। অনেক কারখানার কাজ এমন ভাবে চলিতেছে যে যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহারা দরজা বন্ধ করিতে পারে।

সমস্ত প্রদেশের খবর লইলে দেখা যাইবে যে বাঙ্গালার এত রকমের ছোট ছোট শিল্প-কারখানা চলিতেছে যাহা অন্য কোনও প্রদেশে নাই— গত ২৫।৩০ বৎসর বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নানাস্থান শিল্প-কারখানা খুলিয়া কিছুদিন সাফল্যের সহিত কার্য্য চালাইয়া সহসা তাহা বন্ধ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন বা চাকুরী অবলম্বন করিয়াছেন। ছোট ছোট নিত্য ব্যবহার্য্য বহু জিনিষের কয়েখানা বাঙ্গলায় গড়িয়া উঠিতেছিল কিন্তু কেহই মাথা তুলিতে পারে নাই; ইহার একটী কারণ প্রথমেই বলিয়াছি; দ্বিতীয় কারণ, স্বজাতি ধনীদের ব্যবহার; ইঁহারা ছোট শিল্প-কারখানার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আদৌ আস্থাবান নহেন; ইঁহারা জিনিষের কাটতি অপেক্ষা জিনিষের "সম্মানের" উপর অধিক আস্থাবান ও আগ্রহশীল। ইঁহারা জমী ও জহরতাদি বন্ধক এবং হ্যাণ্ড-নোটের কাজ ভিন্ন অন্য কার্য্যে টাকা ধার দেন না; ইঁহাদের মধ্যে যাহারা আপ্-টু-ডেট তাঁহারা বড় জোর সেয়ার মার্কেটের কিছু কাজ করেন, কিন্তু সেখানেও তাঁহারা নগণ্য।

বাঙ্গালায় শিল্প-কারখানাওয়ালাকে সাহায্য করিবার জন্য নানা প্রস্তাব নানা সময়ে হইয়াছে তন্মধ্যে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট পদ্ধতি একটী; কিন্তু শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্য্য বিস্তৃত করিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। এই ত্রুটী দূর করিবার জন্য বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সচেষ্ট হন, তাহার কার্য্যপদ্ধতিতে যতই ত্রুটী-বিচ্যুতি প্রকাশ পাইয়া থাকুক্, অনেকের বিশ্বাস যদি কর্ত্তৃপক্ষগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে ব্যাঙ্কটির এ দুর্দ্দশা হইত না। অনেক অসাধু কারখানাওয়ালা এই

ব্যাঙ্ককে ঠকাইয়া টাকা লইয়াছে, আবার সাধু ব্যবসাদারের মুখে এখনও এই ব্যাঙ্কের প্রতি সহানুভূতির কথা বহুস্থানে শুনিতে পাই; তাঁহারা ব্যাঙ্কের তিরোধানে সবিশেষ ব্যথা পাইয়াছেন এবং যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। ইহা ব্যাঙ্কের পক্ষে গৌরবের কথা; রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাব ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে বহু অনুষ্ঠানকে তাহার ধাক্কা খাইতে হয়। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক উহার অলন্ত দৃষ্টান্ত। এইজন্য ইংরাজ সওদাগরেরা স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে নারাজ; কারণ, আবশ্যক হইলে অতি-ক্ষমতাশীল প্রতিপক্ষের দল অসূয়া-পরবশ হইয়া সহকর্ম্মীর বিলোপ সাধনও করিতে পারে; বাঙ্গালী ব্যবসায়ীসম্প্রদায়ে এরূপ চেষ্টা আত্মপ্রকাশ না করিলেই মঙ্গল, অন্ততঃ এরূপ প্রতিযোগীতা-মূলক চেষ্টা করিবার উপযুক্ত দল এখনও এখানে সৃষ্ট হয় নাই। যাহা হউক, এখন আমাদের প্রধান চেষ্টা হওয়া উচিত

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবজাত শিল্প ও কারখানা-গুলিকে আবশ্যকমত টাকা জোগাইবার ব্যবস্থা। অনেকে লিমিটেড কোম্পানী করিয়া টাকা সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ধনীরা এরূপ প্রতিষ্ঠানের অংশীদার না হইয়া তাহার উত্তমর্ণ হওয়ার জন্য লিমিটেড কারবারও সুবিধা করিতে পারিতেছে না; অংশীদারী কারবার একটীও টিকিতেছে না। এ সকলের মূলে যে চরিত্রগত নৈতিক ত্রুটী নিহিত আছে, সে সম্বন্ধে যতক্ষণ না **শিক্ষাবিস্তার** হইতেছে ততক্ষণ বাঙ্গালার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন নহে। যতক্ষণ না ধনীগণ এ বিষয়ে সচেষ্ট হইতেছেন, বা টাকা ধার দিয়া অধমর্ণের কার্য্যকলাপের উপর খরদৃষ্টি না রাখিতেছেন, যাহাতে অধমর্ণগণ টাকা বাক ধরবার নষ্ট না করিয়া ফেলে, ততক্ষণ যে কিছু হইবে এমন মনে হয় না। উপযুক্ত অভিজ্ঞতা ফলেই এরূপ ভাবিবার ও নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিবার সাহস করিতেছি। সাধারণতঃ আমরা দাস-মনোবৃত্তি সম্পন্ন বলিয়াই হউক, আর যে কোন কারণেই হউক, আমাদের মাথার উপর কেহ চাবুক ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে আমরা যেমন কাজটী করি, আমাদের মাথার উপর হইতে ঐরূপ কর্ত্তৃত্ব সরাইয়া লইলে আমরা আর সেরূপ কাজ করিতে পারি না। সহকারী বা কর্ম্মাধ্যক্ষ হিসাবে বাঙ্গালীর জোড়া ভারতে নাই, কিন্তু স্বাধীন ভাবে নিজের কাজ করিতে হইলে আমরা প্রায়ই সব গোলমাল করিয়া ফেলি। তাহার উপর আরও লক্ষ্য করিয়াছি যে প্রকৃত খবরদারী করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা ও বিচারশক্তি আমাদের মধ্যে বড় কম; নাই—এমন কথা বলিনা, যেখানে আছে সেখানে সাফল্য লাভও হইয়াছে, যেখানে নাই সেখানে অসাফল্য ঘটিয়াছে। যদি একটা বেঙ্গল কেমিক্যাল তৈয়ারী হইতে পারে তাহা হইলে ঐভাবে অনুরূপ কারখানা সকল গড়িয়া উঠেনা কেন? অভাব উপযুক্ত কার্য্যকরী লোকের এবং অভাব পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের এবং টাকার যোগানে। যতক্ষণ না শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে সাহায্য করিবার জন্য ধনীরা অগ্রসর হইতেছেন, ততক্ষণ কোনও কার্য্যক্ষেত্রই বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিবে না। বেঙ্গল কেমিক্যাল বা বেঙ্গল ইমিউনিটী এই দুইটীর সাফল্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, বেশ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে আমার উক্তিরই সমর্থন-যোগ্য কারণ পাওয়া যাইবে। চাই কর্ম্মী, চাই অর্থ-যোগান, আর চাই বিশ্বাস এবং খবরদারী। একই জাতীয় ব্যবসা-দারদের মধ্যে সহস্র প্রতিযোগিতা থাকিলেও তাহাদিগকে একই একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিভিন্ন সভ্য হইয়া একযোগে কাজ করিতে হইবে; একান্নবর্ত্তী পরিবারের মূলনীতি ও কার্য্য পদ্ধতি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি বা আমরা এখন উহাতে বিশ্বাসবান্ নহি; ক্রেডিট সোসাইটিজ, ইন্সুরিউরেন্স, ব্যাঙ্কিং, যাহারই মূল নীতি বিশ্লেষণ করা যাইবে তাহার মধ্যেই একান্নবর্ত্তী পরিবারের মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যাইবে, ব্যবস্থা বা কার্য্যপ্রণালীর ব্যতিক্রম হইতে পারে কিন্তু মূলনীতি ও উদ্দেশ্য একই; বাঙ্গালীকে আবার উহার সন্ধান লইতে হইবে এবং সময়োপযোগী করিয়া উহার পুনর্গঠন করিয়া লইতে হইবে। ইহার মধ্য দিয়াই আমরা কতকটা উন্নতি করিতে পারি। আগে প্রত্যেক ব্যবসা, শিল্প-বাণিজ্যের এক একটি একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠন আবশ্যক; এসোসিয়েশন বা চেম্বার প্রথা ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই এসোসিয়েশন সকল এমন ভাবে গঠন করিতে হইবে যে প্রত্যেক ব্যবসায়ী স্বীয় এসোসিয়েশনের বাহিরের কোনও ব্যবসায়ীকে সাহায্য করিবেন না। বর্ত্তমান ব্যবসা-বাণিজ্যাদি কোনও ব্যাপারে এসোসিয়েশন না করিয়া কাজ চালান অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী এসোসিয়েশনপ্রিয় হইলেও ইহাতে তাহার কার্য্যকুশলতা ও আন্তরিকতার বড়ই অভাব—সকলেই চায় ফাঁকি দিয়া কাজ

সারিয়া লইতে এবং যিনি যত ফাঁকীবাজ তিনি ততই আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ফাঁকিতে কাজ হয়না, ফাঁকিতে যাহা হয় তাহা বেশী দিন টিকে না; ফাঁকি ধরা পড়িতেও বিলম্ব হয় না কিন্তু ফাঁকিবাজ ধরা পড়িলে সেই বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। অদূরদর্শীতা, পরশ্রীকাতরতা, কোপন স্বভাব এবং স্বল্পে সন্তোষ বা "ছিঁচ্‌কে চুরি"-স্বভাব এই কয়টী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর আর কয়েকটি দোষ। যখন বাঙ্গালার ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প বাঙ্গালীর হাতে ছিল তখন লোকে এই সকল ত্রুটীর সন্ধান পায় নাই; এখন অন্য প্রাদে-শিকের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ায় আমরা আমাদের ত্রুটী বিচ্যুতি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। এ সকল সংশোধন করা অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এসোসিয়েশন, ডিবেটিং ক্লাব, অর্থ-নৈতিক সমিতি ইত্যাদির উদ্বোধন ও বিস্তারের বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রে যাঁহারা আছেন তাঁহারা যে কী অসুবিধার মধ্য দিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন তাহা সাধারণে সম্যক জানেন না, কিন্তু জানা এবং সাবধান হওয়ার সবিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কি বোম্বাই, কি পাঞ্জাব, কি মাদ্রাজ সর্ব্বত্রই লোকে এবিষয়ে সজাগ এবং ব্রতী হইয়াছে; বাঙ্গালাও— হাঁ, কিন্তু বাঙ্গালায় যাঁহারা জীবনী-শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন তাঁহারা সজাগ না হইলে কোনও কাজই সিদ্ধ হইবে না। বাঙ্গালায় ধনী জমীদার ইত্যাদির সমাজ যদি চক্ষু মুদিত করিয়া কেবল সুদের পয়সার হিসাবে মসগুল থাকেন তাহা হইলে সহসা একদিন দেখিবেন যে সোনার দাম ৩০৲ হইতে ২০৲ হইয়া গিয়াছে; অথবা এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিবে যাহার জন্য তাহাদের কোষাগারের অর্থ সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ থাকিলেও কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যাইবে। যাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ দেশের ও দশের কার্য্যে লাগে না, তাহাদের অর্থ-হানিতে বা দারিদ্র্যে লোকে একবিন্দুও বিচলিত বা সহানুভূতি সম্পন্ন হয় না। যে জমীদার প্রজার দুঃখ কষ্টে সহানুভূতি সম্পন্ন, তাহাদের বিপদ-আপদের সময় প্রজা প্রাণ দিয়া তাহাকে স্বীয় পিতামাতা জ্ঞানে সাহায্য করিয়া থাকে। যাহারা কেবলমাত্র মৌখিক সহানুভূতি সম্পন্ন, দুঃস্থের সাহায্যে যাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ নিযুক্ত হয় না তাহাদের আপদে-বিপদে সাধারণে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া থাকে। বাঙ্গালায় কয়েকটী অধিষ্ঠান অবধি শেষোক্ত ব্যাধি-পীড়িত, সেজন্য তাহারা নিজেদের সভ্যগণেরও বিরক্তি এবং অসন্তোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা যদি এখনও সাবধান হইয়া চলে তাহা হইলে ইহাদেরও মঙ্গল, দেশেরও মঙ্গল।

উদাহরণ দ্বারা ব্যাপারটী খুলিয়া বলি; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় একটী সম্পত্তি নানা কারণে একলক্ষ টাকার উপর ঋণ ভারে জড়িত হইয়া পড়ে; কারণ রিসিভার মহাশয়ের কর্ত্তব্য বিচ্যুতি; এই দেনার জন্য জমীদারিটী হস্তান্তর হইবার সম্ভব হয়; রিসিভার ফেরারী হন বলিলেই চলে। এই জমীদারীতে বহু ধনী চাষী-প্রজা ছিল এবং শিক্ষিত ধনীরও অভাব ছিল না; তাঁহারা সংবাদ পাইয়াই নিজেরা প্রজার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পঞ্চষষ্টি হাজার টাকা "মাঙ্গন" তোলেন এবং স্থানীয় কর্ম্মচারীকে ঋণ-শোধার্থে উহা প্রদান করেন; কর্ম্মচারীটী মাত্র ছাব্বিশ শত টাকা জমা করিয়া বক্রী টাকা আত্মসাৎ করেন; ইহাতেও প্রজারা নিরুদ্যম না হইয়া পুনরায় টাকা তুলিয়া দেয়। আবার এমন ঘটনাও জানা আছে যেখানে জমীদার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলেও প্রজা তাহাকে এক পয়সা ঋণ স্বরূপও দেয় নাই। ইহা প্রকৃত ঘটনা; ইহা হইতে আমরা কী বুঝি তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? কথায় বলে "মানুষের ব্যবহারটাই থাকিয়া যায়" আর "সৎপথে থাকিলে মাঝ-রাত্রেও অনাহারীর অন্ন জুটে।"

যুদ্ধের সময় সাধু ও অসাধু নানা উপায়ে প্রভূত অর্থ রোজ-গার কর বাবসায়ীদের মধ্যে অসাধুতা নীতির প্রতি "সম্ভ্রম" বাড়িয়া উঠিয়াছিল; অসাধুতা যখন সাফল্য লাভ করে তখন সাধুগণের প্রতি বিশেষ জুলুম হইয়া থাকে এবং তাহারা প্রায়ই নিপীড়িত হয়। যুদ্ধের সময়ের অর্থবানদের মধ্যে কয়জন আজও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে? অসাধু নামে অখ্যাত কয়েকজন ধনীর নামে বদ্‌নাম শুনা যায়, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে তাহাদের অসাধুতা অপেক্ষা দূরদৃষ্টি, কর্ম্মকুশলতা ও কার্য্যতৎপরতা তাহাদের ধনাগমের প্রধান কারণ; যাঁহারা রসমঞ্চ হইতে কিছু নাম ও অর্থ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা কতকটা নিজেদের ত্রুটী ও অক্ষমতার সন্ধান পাইয়া মানে-মানে যাহা পাইয়াছেন তাহাই নাড়া-চাড়া করিয়া খাইতেছেন। মোটের উপর তাঁহারা যৌবনের উত্তাল-তরঙ্গে পড়িলেও সময় থাকিতে সামলাইয়া গিয়াছেন, ফলে শেষে তাঁহাদিগকে বান-চাল হইতে হয় নাই।

উহাদের পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা থাকিলে ইঁহারা এভাবে সরিয়া পড়িতেন না। দুর্দ্ধর্ষ অতি-লোভী অব্যবসায়ীর দল তাল সামলাইতে না পারিয়া অতলে ডুবিয়াছেন। কয়লা-খনির মালিক এবং কয়েকটী কারখানাওয়ালাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই উপসংহারেই উপনীত হই।

কার্য্যব্যপদেশে নানা জাতীয় ও নানা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীর সহিত আলাপ-পরিচয় হয়; উপস্থিত যদিও কিছু মনোভাব পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখা যাইতেছে কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর নীতি ছিল "চাচা আপনা বাঁচা", এখন ব্যবসায়ীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার জন্য চেষ্টিত হইতেছেন, সত্য, কিন্তু ইহার সাফল্যের জন্য কয়েকটী প্রাথমিক আবশ্যকীয় জিনিষের একান্ত আবশ্যক, যাহা না হইলে কোনও সঙ্ঘ-সমিতি কখনও সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্স বহুদিনের প্রতিষ্ঠান, কিন্তু কাগজে কলমে কাজ করা ব্যতীত ইহারা এমন কী কাজের ব্যবস্থা করেন যাহার জন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায় উপকৃত হইতে পারেন এবং নিজেরাও শক্তিশালী হইতে পারেন? ব্যবসায়ী-সঙ্ঘের আদর্শ হওয়া উচিত সাহেবদের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স। উভয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী একই আদর্শের উপর স্থাপিত হইলেও উভয়ের প্রকৃত কার্য্য ক্ষেত্র এবং শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে পার্থক্য কত? চন্দ্র এবং জোনাকির সহিতও ইহাদের পরস্পরের তুলনা হয় না। বরং এ বিষয়ে বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেট অধিকতর শক্তিশালী এবং কর্ম্মকুশল; অবশ্য সিণ্ডিকেটের পূর্ব্ব-কার্য্যকুশলতার এখন যথেষ্ট অপচয় হইয়াছে তাহা হইলেও ইহাকে যে ভাবে গঠন এবং ইহার কার্য্য প্রণালী এমন আদর্শে পরিচালিত করা হইয়াছিল যাহা রক্ষা ও পুষ্ট করিলে এই সিণ্ডিকেটের আদর্শ অন্য সমিতি সকল গ্রহণ করিতে পারিত। ইহার অবস্থার পরিবর্ত্তনে সবিশেষ ক্ষোভ হয় এবং যাহারা ভিতরের ব্যাপার জানেন না তাঁহারা পাঞ্জাবীগণকে দোষী করেন; বস্তুতঃ তাহা নহে; এই প্রতিষ্ঠানটির অবনতির প্রধান কারণ মেধা ও বিজ্ঞাবান বাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্ক—মাত্র ৪।৫ জন বাঙ্গালী সভ্যের চক্রে সিণ্ডিকেট বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইয়াছে, তাহারই ফলে এবং উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে আজ সিণ্ডিকেট পূর্ব্ব শক্তি ও মর্য্যাদা হারাইয়াছে; ইহার মূলে হইতেছে পরশ্রীকাতরতা এবং তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছে ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন আইনজীবী। আইনজীবিকে সাধারণ নিরক্ষর লোক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে, এই সুযোগের অপব্যবহারের ফলেই একটী উন্নতশীল প্রতিষ্ঠান আজ উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির পথে চলিতেছে। এই আইন-জীবির দল এক সময়ে প্রকাশ্য সভায় পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সাহেবকে প্রেসিডেন্ট করিবার জন্য প্রস্তাব করেন এবং পূর্ব্বাহ্নে যথেষ্ট ক্যানভাসিংও হইয়াছিল, কিন্তু নিরক্ষর হইলেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পাঞ্জাবীগণই এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধ করায় প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য হয়; একবার নয়—কয়েকবার এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবার পর অবশেষে একজন সাহেব প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব কয়েকজন বাঙ্গালী বাস্-মালিক ও উত্তমর্ণ জাতীয় পাঞ্জাবীর চেষ্টায় গ্রাহ্য হয়। এস্থলে দোষ দিব কাহাকে? শিক্ষিত বাঙ্গালী উকীল-সভ্যকে না নিরক্ষর পাঞ্জাবীকে? যে কয়জন উত্তমর্ণ জাতীয় পাঞ্জাবী ও শিক্ষাভিমানী অ-বাঙ্গালী ইতঃপূর্ব্বে সিণ্ডিকেটের সভ্যভুক্ত হন নাই, সাহেব-প্রেসিডেন্ট নিয়োগে তাঁহারা আসিয়া ইহাতে যোগদান করেন এবং মাসিক টিকিট প্রবর্ত্তন হওয়ায় বর্ত্তমান সেক্রেটারী মহাশয়ও এই সময়ে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হয়েন। মাসিক টিকিট প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব অধিকতর ভোটে গ্রাহ্য হইবার পরও পূর্ব্বোক্ত কয়েকজন বাঙ্গালী উকীল, যাঁহারা উহার স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারাই সভার বাহিরে আসিয়া দিনের পর দিন মাসিক টিকিট পদ্ধতিভুক্ত হইবার ইচ্ছুক সভ্যগণকে নিরস্ত করিবার এবং নাম কাটাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; পাঞ্জাবীদের মধ্যে এরূপ মনোবৃত্তি সম্পন্ন একজন ব্যক্তিকেও দেখি নাই। যে কয়জন বাঙ্গালী সভ্যের কার্য্যপ্রণালীর কথা বলিলাম, তাঁহারাই বাঙ্গালী সেক্রেটারী তাড়াইবার প্রধান উদ্যোগী ও প্রস্তাবক। কথাটা ব্যক্তিগত বলিয়া অধিক কিছু বলিতে অক্ষম নচেৎ আরও কথা প্রকাশ করিতাম যাহা হইতে জনসাধারণ শিক্ষিতাভিমানী, আইনজ্ঞ বাঙ্গালী সভ্যদের কেরামতী ও মনোবৃত্তি বুঝিতে পারিতেন; ইহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেরা মোটা মাহিনার সেক্রেটারী, আইন-পরামর্শদাতা ইত্যাদি পদ গ্রহণ করেন। সরাসরি তাহার চেষ্টা করিলে বিফল মনোরথ ও অপদস্থ হইতে হইবে জানিয়া ইহারা প্রথমে অ-বাঙ্গালী এমন একজন সেক্রেটারী করিলেন যাঁহাকে তাঁহারা পরে সহজে সরাইতে পারিবেন মনে করিয়াছিলেন,

কিন্তু পদপ্রত্যাশী বাঙ্গালী আইনজ্ঞ-দল শেষ অবধি আর কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না; আমার এ অভিজ্ঞতার অন্য উদাহরণ বাঙ্গালী স্থাপিত বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে পাইবেন, সুতরাং সিণ্ডিকেটের এ প্রণালী উদাহরণ-বিহীন বা সঙ্গীবিহীন নহে; বাঙ্গালী শিক্ষিতদের মধ্যে এই মনোভাব অধিকতর সুপ্রাপ্য—অশিক্ষিতগণ এত পরশ্রীকাতর ও এত অদূরদর্শী নহে—অন্ততঃ আমার অভিজ্ঞতা এইরূপ।

ত্রিশ বৎসর ব্যাপী এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা পদ্ধতির অভিজ্ঞতা হইতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে এসোসিয়েশনের পরিচাযকবৃন্দ সেই ব্যাপার-সম্পর্ক ও স্বার্থ-সম্পর্কশূন্য ব্যক্তি হওয়ার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু কার্য্য-পরিচালক কমিটীর সভ্যগণ সাধারণ সভ্যশ্রেণী হইতে মনোনীত হইবেন; অর্থাৎ যে ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার্থ এসোসিয়েশনের সৃষ্টি সেই ব্যবসায়ীগণ কমিটীর সভ্যমাত্র থাকিবেন; প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ ইঁহারা বাহিরের লোক হওয়া প্রয়োজন; সেক্রেটারী বেতনভুক্ত না হইলে কাজ চলিতে পারে না এবং কমিটীর সভ্যগণের কমিটী মিটিংএ হাজিরের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, বিশেষতঃ যেখানে সভ্যগণের জীবিকার্জ্জনের উপায় ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ। চাকুরীজীবি সভ্যগণের পক্ষে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত আবশ্যকীয়। যাঁহারা মনে করেন যে সমিতির জন্য, সাধারণের জন্য যে কার্য্যের প্রয়োজন তাহা স্বার্থশূন্য ভাবে করা উচিত;—তাঁহারা ঠিকে ভুল করেন; স্বার্থশূন্য অর্থে পারিশ্রমিক শূন্য নহে। পরিশ্রমের জন্য পারিশ্রমিক না পাইলে লোককে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে কী করান যায় না, তাহা না করিলে কার্য্যও সুসম্পাদিত হয় না। ন্যায্য পরিশ্রম কখনও বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না, যেখানে বহুজনের বহু স্বার্থ ও অর্থের ব্যাপার সেখানে বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য লইবার কথা উঠিতেই পারে না। যতক্ষণ এসোসিয়েশন-স্থাপনকারীরা পূর্ব্বেই পারিশ্রমিক দানের এবং খরচপত্রের ব্যবস্থা না করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, সেখানে তাঁহারা কখনও এসোসিয়েশন স্থাপনে বা তাহাকে শক্তিশালী করিতে সক্ষম হইবেন না। বড় বড় গাল-ভরা নাম ও উদ্দেশ্য লইয়া বহু প্রতিষ্ঠান ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজাইতেছে কিন্তু সব অন্তঃসারশূন্য—ফোঁপরা, এবং প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখিবেন যে কোনও চালবাজ বুদ্ধিজীবি লোক গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে কৃপাকণা লাভার্থ এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সচ্ছন্দে পদ লাভের জন্য এবম্বিধ এসোসিয়েশন-স্থাপন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন; গভর্ণমেন্টও এবম্বিধ লোকের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখেন; কোনও বিশেষ কার্য্য উদ্ধারের জন্য তাঁহারা এই জাতীয় লোককে সময়ে সময়ে কৃপাকণা দান করিয়াও থাকেন, যাঁহারা পান না, তাঁহারা ঘোর স্বদেশী হইয়া অন্যরূপ অন্য এসোসিয়েশনের সৃষ্টি করিতে থাকেন। বুদ্ধিজীবি লোকের এইই প্রধান ত্রুটী; আমাদের সমাজে কতকগুলি পেশাদার এসোসিয়েশন-স্রষ্টা আছেন, যাঁহারা ডজন ডজন এসোসিয়েশন করিয়াছেন এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে তিলকে তাল করিয়া নিজের কৃতকার্য্যতার জয়ডঙ্কা বাজাইতেছেন; ইহাতে ভবী ভুলে না; ফলে এবম্বিধ ফাঁকা আওয়াজ শীঘ্র ধরা পড়ে এবং অশিক্ষিত কর্ম্মীর দল ক্রমশঃ এই জাতীয় নহে—সকল জাতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর নাম শুনিলে তাহাদের সৃষ্ট এসোসিয়েশনের ছায়া অবধি মাড়ান না। উপরি উক্ত এসোসিয়েশন-স্রষ্টার দল অন্য কোনও কর্ম্মীর সাফল্য চক্ষেই দেখিতে পারেন না এবং তাহাদের হীনতা ও অসাফল্য প্রদর্শনের কোনও সুযোগ পরিত্যাগ করেন না। এই সকল লোককে দূরে রাখিতে হইবে—ইঁহারা বহু উদীয়মান শিক্ষিত কর্ম্মীর মস্তক ভক্ষণ করিয়াছেন এবং বুদ্ধিমান যুবকগণ ইঁহাদের দল হইতে সরিয়া পড়িয়া নিজ নিজ কাজে মন দিয়া জীবিকা অর্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সব ফাঁকীদার, সমিতি-স্রষ্টাগণ দেশের যত অনিষ্ট করিয়াছেন এত আর কেহ করেন নাই; অনেকের সহিতই ইঁহাদের পরিচয় আছে, আবার বর্ণচোরা বহুশিষ্য অনবরত চাকুরীজীবিগণকে প্রতারিত করিয়া বেড়াইতেছে; সৌভাগ্যের বিষয় ইঁহারা ক্রমশঃ সমাজে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে, ফলে ছিঁচকে চুরি ব্যবসায়ই এখন ইহাদের জীবিকা অর্জ্জনের পথ হইয়াছে। এই সকল কুপথগামী যুবকদের জন্য আন্তরিক দুঃখ হয়; উপযুক্ত উপদেষ্টা ও পরিচালকের হাতে পড়িলে ইহারা অতি উৎকৃষ্ট কর্ম্মী হইতে পারিত কিন্তু কু-গুরুর কুশিক্ষায় ইহারা সম্ভ্রান্ত-বংশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও আচরণের ও আদর্শের দোষে ইহারা ঘৃণ্য হইয়া পড়িয়াছে; ইহাদের কু-আদর্শ শ্রমিকগণের মধ্যে চতুরতর ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় শ্রমিক-সমিতিসকল মাথা তুলিতে পারিতেছে না এবং শ্রমিকগণও বাহিরের লোককে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থাকে। বাঙ্গালী যুবক সমাজের পক্ষে এবং তাহাদের পথ প্রদর্শক গুরুগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত নিন্দাজনক। উদীয়মান বাঙ্গালী যুবক সমাজকে এবিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। তাহারাই সমাজের আশা ভরসার স্থল; প্রৌঢ় বৃদ্ধগণের সে কর্ম্মশক্তি কোথায়? অভিজ্ঞতা-গৌরব তাঁহাদের থাকিতে পারে কিন্তু দৈহিক ক্ষমতার অভাব পূরণ করিবে কে?

বাঙ্গালার যাবতীয় উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি—ব্যবসায়ীর, শিল্পী, কারখানাওয়ালা বা শ্রমিক—যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন, এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সবিশেষ মনঃসংযোগ করিতে হইবে—নাচেৎ গতিরন্যথাঃ। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে এ সকল পাপ না থাকিলেও বাঙ্গালায় বাঙ্গালী স্থাপিত ও পরিচালিত কয়েকটী আদর্শ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবম্বিধ পাপ প্রবেশ করায় ইহার ফল সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক বলিয়া ঘোষিত হইতেছে—ইহার আশু প্রতীকার আবশ্যক।

কৃষি উপনিবেশের একটী পরিকল্পনা

শ্রীবনবিহারী বসু

"চাষবাসে কোনও লাভ নাই, এমন কি খাওয়া পরা চলাও দুষ্কর" ইহাই প্রথমে শুনিতে পাওয়া যায় যখন গ্রামে ফিরিবার কথা উঠে। তথাপি লোকগণনার বিবরণী হইতে দেখা যায় যে চাষের উপর নির্ভরশীল লোক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। কৃষিকার্য্য হইতে উপার্জ্জন হ্রাসের ইহা একটী প্রধান কারণ বটে এবং শিল্পের অবনতি হইতে এই কারণের উদ্ভব। জলসেচের দীঘি, পুষ্করিণী, নদী, খাল প্রভৃতি নানা কারণে হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায়, বিবেচনা শূন্য ভাবে বনভূমি ধ্বংসহেতু (যথা বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে) বৃষ্টির অল্পতা, জলনিষ্কাশনের প্রণালীর অব্যবস্থার জন্য ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতির আধিক্য, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমির বিভাগ ও খণ্ড খণ্ড করণ (Subdivision and fragmantation of land) প্রভৃতি চাষীদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। এই সকলই দূর করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত।

তবুও কৃষিদ্রব্য ও বীজের নির্ব্বাচন, উপযুক্ত সার ব্যবহার সমবায় প্রণালীতে জলসেচের ব্যবস্থা, ইত্যাদি দ্বারা বুদ্ধিমান চাষীরা নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারেন। ফরিদপুরে একবার চাষের প্রদর্শনী (demonstration) হইত, ইহার দুই তিন বৎসর পরে এক ভদ্রমুসলমান চাষী কৃষিবিভাগকে লিখেন যে ঐ প্রদর্শনী হইতে তাঁহার অশেষ লাভ হইয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহার জমিতে ধান ও পাটের আবাদ হইত। এখন কোইয়াটুর শ্রেণীর আকের চাষ করিয়া তাঁহার আয় প্রায় তিন গুণ হইয়াছে।

মেদিনীপুর-বর্দ্ধমান সেচ-রাজস্ব (Irrigation-Revenue) বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলেন যে চাষ বাস হইতে ভদ্রযুবকেরা স্বচ্ছলভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তবে তাঁহাদের চাষীদের মতনই কাজ হইবে। ঝাড়গ্রামে এক ভদ্র যুবক কৃষিকার্য্য দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। পূর্ব্বে ইঁহার কলিকাতায় ব্যবসা ছিল। লোকসান হওয়ায় উহা উঠিয়া যায় এবং তিনি এই পথ অবলম্বন করেন। মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলে এমন বিস্তর জমি পড়িয়া আছে যাহা শুধু লোকাভাবে চাষ হইতেছে না। জমিদারেরা ঐ সকল জমি নামমাত্র খাজনায় বিলি করিতে উদ্‌গ্রীব। আজকাল কোনও কোনও স্থানে সাঁওতালেরা কিছু কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে। অবশ্য ঐ সকল স্থানে ম্যালেরিয়া কিছু বেশী, কিন্তু জমির উর্ব্বরতা ও জলসেচের ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল।

নিম্নে প্রদত্ত একটী কৃষি উপনিবেশের পরিকল্পনার প্রতি গবর্ণমেণ্ট ও উৎসাহী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আহ্বান করা যাইতেছে। এই পরিকল্পনা-অনুযায়ী কাজ করিলে শিক্ষিত ভদ্রযুবকদের অন্ন-সমস্যার কতকটা প্রতিকার হইবে বলিয়া আশা করা যায়; সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

একস্থানে অন্যূন ১৫০০ বিঘা জমি লইতে হইবে। জমি এইভাবে ভাগ হইবে :—গ্রাম—২০০ বিঘা, গোচারণ মাঠ —১০০ বিঘা, জলসেচনের জন্য ১০০ বিঘা, পতিত জমি (ভাগাড়, আবর্জ্জনা প্রভৃতির জন্য নির্দ্দিষ্ট) ৫০ বিঘা, চাষের জমি—১,৫০০ বিঘা। যেখানে নদী হইতে সেচের ব্যবস্থা হইতে পারে সেখানে সেচের জন্য এত জমি লাগিবে না, উদ্বৃত্ত জমি চাষের কাজে লাগিবে। প্রত্যেক চাষীকে ১৫ বিঘা করিয়া জমি দেওয়া হইবে। ৫০ জন যুবককে লইয়া কাজ আরম্ভ করিলে ৭৫০ বিঘা জমি প্রথম বৎসরে আবাদ হইবে। দ্বিতীয় বৎসর হইতে সমস্ত জমিই আবাদ হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। গ্রামের প্রতিবৃক্ষের জন্য অন্ততঃ ১ বিঘা করিয়া জমি রাখা হইবে। বাকি জমি রাস্তা নালা, পুষ্করিণী, বাজার, গ্রামের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ প্রভৃতির জন্য থাকিবে।

উপনিবেশটী এই ভাবে গঠিত হইবে :—কর্ম্মকর্ত্তা (কৃষি

বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি)—১জন ভদ্রযুবক চাষী, ৫০ জন (পরে ৭০ জন), ডাক্তার ১জন, কম্পাউণ্ডার ১জন, নাপিত ১জন, ধোপা ১জন, কামার ১জন, ছুতার ১জন, কুমোর ১জন, চামার ১জন, মেথর ১জন, মোট—৬০ জন। যুবকদের সুস্থ, কর্ম্মঠ ও নিয়মানুবর্ত্তী হইতে হইবে।

এইবার ব্যয়ের একটা আনুমানিক হিসাব দেওয়া যাইতেছে—

	১ম বৎসর	৫ বৎসরে
কর্ম্মকর্ত্তা ও তাঁহার অফিস মাঃ ১৫০৲ হিসাবে	১,৮০০৲	৯,০০০৲
ভদ্রচাষীদের প্রত্যেককে মাঃ ২০৲ হিসাবে ১ম বৎসর ৫০ জন ৪র্থ „ ৭০ জন	১২,০০০৲	৭৯,২০০৲
খাজনা ২ বিঘা হিঃ—	৩,০০০৲	১৫,০০০৲
ডাক্তার মাঃ ৭৫৲ হিঃ—	৮৪০৲	৪,২০০৲
কম্পাউণ্ডার মাঃ ২০৲ হিঃ—	২৪০৲	১,২০০৲
মেথর মাঃ ১০৲ হিঃ—	১২০৲	৬০০৲
ঔষধ পত্রাদি— ১ম বৎসর—৫০০৲ ৪ বৎসর—২৫০৲ হিঃ	৫০০৲	১,৫০০৲
বাড়ী ঘর আসবাব পত্রাদি ১ম বৎসর—৫,০০০৲ ২য় „ —২,০০০৲ ৩য় „ — ৫০০৲ হিঃ	৫,০০০৲	৮,৫০০৲
জলসেচ, মজুরী, পানীয় জল, পথ, নালা প্রভৃতি— ১ম বৎসর—১০,০০০৲ ২য় „ — ১,৫০০৲ ৩ বৎসর— ৫০০৲	১০,০০০৲	১৩,০০০৲
বীজ, লাঙ্গল, বলদ ইত্যাদি ১ম বৎসর—৮,০০০৲ ২য় বৎসর—৩,০০০৲ ৩ বৎসর— ৫০০৲ হিঃ	৮,০০০৲	১২,৫০০৲
অন্যান্য—৫০০৲ হিঃ—	৫০০৲	২,৫০০৲
মোট—	৪২,০০০৲	১,৪৭,২০০৲

দ্বিতীয় বৎসর হইতে বীজের জন্যই অল্পই খরচ হইবে। নূতন জমি যদি পুরাতন চাষীরা কিম্বা তাঁহাদের নিকট আত্মীয়েরা লন তাহা হইলে খরচ আরও কম হইবে। ধোপা নাপিত প্রভৃতিকে কিছু টাকা অগ্রিম দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু উহা ১ বৎসরের মধ্যেই পরিশোধ করিতে হইবে।

এক্ষণে এই উপনিবেশ হইতে ৫ বৎসরে খরচের টাকা উঠান যাইতে পারে কিনা দেখা যাক্। বিঘা প্রতি ৩৫৲ আয় ধরিলে বেশী হইবে না। ইহার অধিক আয় যাহা হইবে তাহা চাষীদের প্রাপ্য। দ্বিতীয় বৎসরে বিঘা প্রতি আয় ৩০৲ এবং পরের বৎসরগুলিতে ৩৫৲ করিয়া ধরিলে ৫ বৎসরে মোট আয় এইরূপ হইবে :—

২য় বৎসর— ৭৫০ বিঘা ৩০৲ হিঃ—	২২,৫০০৲
৪ বৎসর—১০৫০ „ ৩৫৲ হিঃ—	১,৪৭,০০০৲
৫ বৎসরে মোট আয়—	১,৬৯,৫০০৲

ইহার মধ্যে অন্য প্রকারের আয় (যথা দোকান, ভাগাড় প্রভৃতি হইতে) ধরা হইতেছে না। তাহা হইলেও ব্যয় অপেক্ষা আয় ২২,৩০০৲ বেশী হইবে। সম্ভবতঃ আয় আরও অধিক হইবে।

পঞ্চম বৎসরের শেষে (ষষ্ঠ বৎসরের শস্য আহরণের পরে) উপনিবেশিকেরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করিতে পারিবেন। বাহির হইতে কর্ম্মকর্ত্তার আবশ্যক হইবে না। পল্লীসভা বা পঞ্চায়েৎ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। কৃষিকার্য্য ও ক্রয় বিক্রয় যতদূর সম্ভব সমবায় প্রণালীতে চলিলেই ভাল। জলসেচ ও বীজ-ভাণ্ডারে সমবায় নীতিতে চলা একান্ত আবশ্যক।

দুই লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া এক সঙ্গে ৫টী উপনিবেশের পত্তন করা যাইতে পারে, এবং যেমন যেমন টাকা উপনিবেশ হইতে উঠিয়া আসিবে তেমনি তেমনি নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপন করা চলিবে।

ভারতীয় জীবনবীমার দিগ্‌দর্শনী

শ্রীসুধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী

সভ্যতার ইতিহাসে বীমার একটী নিজস্ব স্থান রহিয়াছে। যে সকল প্রগতিশীল জাতি আজ সমগ্র জগৎটার অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তাহাদের লেনদেন কারবারে বীমা-ব্যবসায়ের একটী অতি সুস্পষ্ট স্থান রহিয়াছে। সমাজের দিক দিয়াও বীমার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে; তাহা আজকাল সকলেই অল্প বিস্তর অনুধাবন করিতে পারিতেছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের যে একটা স্থূল অর্থকরী মূল্য আছে, তাহা এই অর্থনিয়ন্ত্রিত পৃথিবীতে আর বুঝিবার বাকী নাই। মরণের পরেও মানুষের জীবনের আর্থিক দিকটা যাহাতে ব্যাহত হইয়া না যায়, তাহারই প্রতিরোধের জন্য বীমার প্রবর্ত্তন। মৃত্যুর পর উপার্জ্জনশীল গৃহস্থের উত্তরাধিকারিগণ যেন বৃহত্তর সমাজের গলগ্রহ হইয়া না পড়ে, তাহার একটা উপায় বীমা। যে অশক্ত ও সম্বলহীন, সে সমাজ দেহের একটা দুষ্ট ব্রণের মত। সমাজ তাহার নিমিত্ত সদা-বিব্রত। এইরূপ জীবনের বোঝার হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার দিক হইতেও বীমার প্রয়োজনীয়তা আজকাল জনসাধারণ সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। জাতীয় জীবনের ব্যষ্টির সঞ্চিত অর্থ ব্যাপক ভাবে জাতীয় মঙ্গলকর নানারূপ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করিয়া বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি দেশীয় নানারূপ শিল্প-ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার সাহায্য করে। জাতীয় জীবনের দুরন্ত অন্ধকারে বীমাকোম্পানীগুলি কি ভাবে আশার আলো বহন করিয়া আনে, তাহা আমরা বিলাতের বিখ্যাত "প্রভেডেন্সিয়াল কোম্পানীর" ইতিহাস হইতেই জানিতে পারি। গত ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় উক্ত কোম্পানী ব্রিটীশ গভর্ণমেন্টের যে সাহায্য করিয়াছে তাহা মহাযুদ্ধের ইতিহাসের একটা অপূর্ব্ব অধ্যায়।

আমাদের দেশে আজ কাল একটা আত্মচেতনা দেখা যাইতেছে। এই আত্মচেতনা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই নয়; কারণ নিছক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন কখনই সার্থক হইতে পারে না যে-পর্য্যন্ত না তাহা অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান জগতে রাষ্ট্রীয় স্বরাজ অর্থনৈতিক স্বরাজের রূপবিবর্ত্তন মাত্র। এই খাঁটি ও সহজ সত্যটুকু আজকাল আমরা বুঝিতেছি—সমগ্র জাতীয় জীবনের বিপর্য্যস্ত কৃচ্ছ্রতার বিনিময়ে। এই সচেতন মনোবৃত্তির ফল স্বরূপ দেখিতে পাই যে আজ কাল বীমাব্যবসা বা বীমাপ্রসঙ্গ আলোচনা অর্দ্ধ-শিক্ষিত অনন্যোপায় যুবকের ক্রীড়াক্ষেত্র নয়, ইহা আজ একটী সম্মানজনক ও সূক্ষ্ম বিজ্ঞানানুমোদিত বিদ্যা হিসাবে শিক্ষিত ও মার্জ্জিত-রুচি যুবকসম্প্রদায়ের কাম্য কর্ম্মভূমি। অর্থের দিক হইতে এই ব্যবসার সম্ভাবনা যেরূপ সুদূর-প্রসারী, মানুষের নানারূপ আকস্মিক বিপদ-আপদের দিক হইতেও ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রচুর।

জাতীয় সমৃদ্ধি গঠনে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির স্থান অতি উচ্চে। যে দেশ যত উন্নত, তাহাদের দেশে বা সে জাতির মধ্যে বীমার প্রসার নিশ্চয়ই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বেশী হইবেই। এই হিসাবে বীমার প্রসার সভ্যতার একটা মাপকাঠি। নিম্নলিখিত সংখ্যানুবৃত্তি পাঠে নানা দেশের চলতি কারবারের পরিমাণ অনুসারে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বোঝা যাইবে।

১৯২৯ সন

ডলার হিসাবে

১০ লক্ষ ডলার

স্থান	দেশ	১০লক্ষ ডলার হিসাবে
১ম	আমেরিকা	১০৩,১৪৬
২য়	গ্রেটব্রিটেন	১১,৭০৫
৩য়	কানাডা	৬,৬০৮
৪র্থ	জাপান	৩,৯৭২
৫ম	জার্ম্মাণী	৩,৭৭২
৬ষ্ঠ	সুইডেন	১,২৫৯
৭ম	নেদারল্যাণ্ডস্	১,০৫৫
৮ম	ইটালী	১,০৩১

স্থান	দেশ	১০ লক্ষ ডলার হিসাবে
৯ম	ফ্রান্স	৮,৮৪
১০ম	ভারতবর্ষ	২,৫৯

উপরি উক্ত সংখ্যানুলিপি পাঠে ভারত যে "শুধুই ঘুমিয়ে রয়" ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৯১৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা ভারতীয় বীমা সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিবহাল ছিলাম না। ঐ বৎসর হইতেই ভারতসরকার সরকারী এ্যাক্‌চুয়ারী বা হিসাবপরীক্ষক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া ভারতীয় বীমার যথার্থ প্রগতির একটা নিদর্শন পত্র জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করে। কিন্তু বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই এদেশে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবসা এতদেশে ততটা জনপ্রিয় না হওয়ায় ও জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রচার ততটা ব্যাপক না হওয়ায় এই সমস্ত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা সময়ে ঢক্কানিনাদ ততটা হয় নাই। কিন্তু ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে দুইটী প্রাধানতম ও প্রাচীনতম কোম্পানী স্থাপিত হয় গত শতাব্দীর মধ্যার্দ্ধে। "বোম্বে মিউচ্যুয়াল" ১৮৭১ সনে স্থাপিত হয়; "ওরিয়েন্টাল" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৪ সনে। ১৮৯০ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জীবনবীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল কেবলমাত্র ১২টী, তন্মধ্যে বাংলার স্থান ছিল না। বাংলাদেশের প্রথম কোম্পানী স্থাপিত হয় ১৮৯১ সনে; এই বৎসর "হিন্দু মিউচ্যুয়াল কোম্পানীর" প্রতিষ্ঠা। আজ বাংলাদেশ নিখিল ভারতের শতকরা বিশভাগ কোম্পানী দাবী করিতে পারে। নিম্নলিখিত বিবরণ-পঞ্জী পাঠে বিভিন্ন বৎসরে নিখিল ভারতে বাংলা দেশে স্থাপিত কোম্পানীগুলির একটা সংখ্যা-বিবৃত্তি পাওয়া যায়;—

বৎসর	কোম্পানীর সংখ্যা	
	ভারত	বাংলা
১৮৯০	১২	০
১৯০০	২১	১
১৯১০	৩২	৬
১৯২০	৫৮	১২
১৯৩০	১০৩	২০
১৯৩২	১৩৬	২৫
১৯৩৩	১৩৯	২৬

ভারতবর্ষে জীবনবীমা কার্য্যের প্রসার একটা সুসংযত ও সহজ পথ দিয়া গতি লাভ করিয়াছে, এই প্রগতি অত্যন্ত ধীর ও নিয়মানুগ। কোন জিনিসেরই হঠাৎ বৃদ্ধি স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। ভারতীয় জীবনবীমার অত্যন্ত ধীর পদবিক্ষেপ সেই নিমিত্তই স্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে এই সহজ বৃদ্ধির পরিমাণ অনুধাবন করা যাইবে;

বৎসর	মোট বীমার পরিমাণ কোটী টাকায়	বৎসর	মোট বীমার পরিমাণ কোটী টাকায়
১৯২০	৩১ (আনুমানিক)	১৯২৬	৫৩
১৯২১	৩৪	১৯২৭	৬০
১৯২২	৩৭	১৯২৮	৭১
১৯২৩	৩৯	১৯২৯	৮২
১৯২৪	৪২	১৯৩০	৮৯
১৯২৫	৪৭	১৯৩১	৯৮

ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির নূতন সংগৃহীত কাজের পরিমাণ আলোচনা করিলে ইহা স্বতঃই বোঝা যাইবে যে, এই বৃদ্ধি মোটেই আকস্মিক নহে, ইহা বৎসরের পর বৎসর অত্যন্ত ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে দেশে শিক্ষা ও আত্মচেতনার উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তাহার জীবনের দায়ীত্ব সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হইতেছে। তাহা ছাড়া পারিবারিক জীবনে মানুষের যে একটা সুস্পষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা পালন করিতেও আজ সে অনেকটা সচেতন হইয়াছে। মোট কথা তাহার সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি আজ নানা দিকেই জাগ্রত হইয়া বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। নিম্নলিখিত সংখ্যাবিবরণী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ১৯১৬ সনে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির নূতন সংগৃহীত কাজের পরিমাণ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ভাবে কমিয়া গিয়াছিল। ইহার কারণ ইয়ুরোপের মহাযুদ্ধের ফল-স্বরূপ সমগ্র জগৎব্যাপী অর্থ কৃচ্ছ্রতা; ইহা ছাড়া ১৯৩০ সনেও নূতন সংগৃহীত কার্য্য আশানুরূপ হয় নাই; ইহার কারণও দুনিয়াব্যাপী অসচ্ছলতা।

বৎসর	ভারতীয় জীবন বীমার মোট কাজ (কোটী টাকায়)	বৎসর	ভারতীয় জীবন বীমার মোট কাজ (কোটী টাকায়)
১৯১৪	৩'২	১৯২৩	৫'৮
১৯১৫	২'২	১৯২৪	৬'৯
১৯১৬	১'৭	১৯২৫	৮'১
১৯১৭	২'২	১৯২৬	১০'৪
১৯১৮	২'৯	১৯২৭	১২'৮
১৯১৯	৪'৫	১৯২৮	১৫'৫
১৯২০	৫'১	১৯২৯	১৬'৫
১৯২১	৫'৫	১৯৩০	১৭'৭
১৯২২	৫'৬		১৭'৭

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম বিলাতী জীবনবীমা কোম্পানীগুলির অনেকে এদেশে তাহাদের শাখা কার্য্যালয় স্থাপন করে। বস্তুতঃ এই সকল কোম্পানীর কর্ম্মিগণ দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম এদেশে জীবনবীমা জনসাধারণের পরিচয়পথে আসে।

"এলবার্ট" ও" ইয়ুরোপীয়ান" নামক দুইটী বিদেশী কোম্পানীর শোচনীয় দুর্গতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশবাসী বিদেশে বীমা করিবার বিপদ সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হয় নাই। ক্রমে ক্রমে জাতীয় রাষ্ট্র-চেতনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের লোক ক্রমশঃই দেশীয় কোম্পানীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল; কারণ বিদেশী কোম্পানীগুলি এদেশের জনসাধারণ হইতে বীমার চাঁদা বাবৎ যে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে, তাহা এদেশের শিল্প-বাণিজ্য ব্যপদেশে ব্যবহৃত না হইয়া পরদেশী রাষ্ট্রীয় শক্তির বনিয়াদ্ দৃঢ় করিয়া তোলে। এই সমস্ত নানারূপ কারণ-পরম্পরায় ভারতীয় জীবনবীমার বহুল অংশ বিদেশী কোম্পানী হইতে দেশীয় কোম্পানীতে আসিয়া পড়িতেছে। এই পরিবর্ত্তনের গতি যে মন্থর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট। নিম্নপ্রদত্ত সংখ্যা-বিবৃত্তি এই বিষয়টী প্রাঞ্জলভাবে পরিস্ফুট করিতেছে :—

বৎসর	ভারতীয় বীমার মোট পরিমাণ (কোটী টাকায়)	বিদেশীয় কোম্পানীর অংশ (কোটী টাকায়)	দেশীয় কোম্পানীর অংশ (কোটী টাকায়)
১৯২৭	১২০	৬০	৬০
১৯২৮	১২৪	৫৩	৭১
১৯২৯	১৪২	৬০	৮২
১৯৩০	১৫৪	৬৯	৮৫

চলতি কারবারের পরিস্থিতি অনুসারে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলি যে ক্রমশঃই শক্তি সঞ্চয় করিতেছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। নিম্নপ্রদত্ত সংখ্যালিপি ইহার প্রমাণ দান করিবে,—

বৎসর	বৃদ্ধির পরিমাণ (কোটী টাকায়)
১৯২০	৩১
১৯২১	৩৪
১৯২২	৩৭
১৯২৩	৩৯
১৯২৪	৪২
১৯২৫	৪৭
১৯২৬	৫৩
১৯২৭	৬০
১৯২৮	৭১
১৯২৯	৮২
১৯৩০	৮৯
১৯৩১	৯৭

ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির জীবনীমা ফণ্ড ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র জাতির ধনভাণ্ডার শক্তি-সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে। বীমাভাণ্ডারের এই গচ্ছিত অর্থ জাতীয়-অর্থ হিসাবে একটা জাতির বর্দ্ধমান আর্থিক ক্ষমতার পরিচয় জ্ঞাপন করে। যে-পরিমাণে এই ভাণ্ডার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে মনে হয় অচিরেই এই ভাণ্ডার আমাদের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য আনয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। নিম্নের সংখ্যালিপি পরীক্ষা করিলে এই বৃদ্ধির পরিমাণ সহজেই বোঝা যাইবে,—

বৎসর	জীবনবীমা ফণ্ড (কোটী টাকায়)
১৯১৩	৫'৮৩
১৯১৫	৬'৭৭
১৯২০	৮'৪৭
১৯২৫	১২'৫৭
১৯৩০	১৮'৫৩
১৯৩১	২২'৫

১৯৩২ সনের ভারত সরকার প্রকাশিত বীমা-বিবরণী পাঠ করিলে ভারতীয় জীবনবীমার অনেকগুলি আধুনিক জ্ঞাতব্য তথ্য জানা যাইতে পারে।

ভারতীয়

বৎসর	প্রদেশ	কোম্পানীর সংখ্যা
	বোম্বাই	৬০
	বাংলা	২৫
	মাদ্রাজ	২১
৮	পাঞ্জাব	১৪
৩	দিল্লী	৮
৯	মধ্যপ্রদেশ	২
৮	আজমীড়	২
	বিহার	২
	ব্রহ্মদেশ	১
	সংযুক্তপ্রদেশ	১

মোট ১৩৬

অভারতীয়

বৎসর	দেশ	কোম্পানীর সংখ্যা
	গ্রেটব্রিটেন্	৭১
৮	কানাডা	৩১
৪	বিভিন্ন ইয়ুরোপীয় দেশ	১৮
৩	আমেরিকা	১২
	জাপান	৯
৮	জাভা	৫

মোট ১৪৬

ভারতীয় কোম্পানীগুলির অধিকাংশই জীবনবীমার কাজ করিয়া থাকে, ইহাদের সংখ্যা ১০৩টী। বাকী ৩৩টী কোম্পানীর মধ্যে ২০টী জীবনবীমার সহিত অন্যান্য বীমার কাজ করিয়া থাকে এবং ১৩টী জীবনবীমা ব্যতীত কেবলমাত্র অন্যান্য বীমার কাজ করিয়া থাকে। অভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই জীবনবীমা ব্যতীত অন্যান্য বীমার কাজ করিয়া থাকে। ১৪৬টী অভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে ১২২টী জীবন-বীমা ব্যতীত অন্যান্য বীমার কাজ করে, মাত্র ১০টী জীবনবীমার কাজ করে এবং ১৪টী অন্যান্য বীমার সহিত জীবনবীমার কাজ করিয়া থাকে।

১৯৩১ সনে ভারতবর্ষের বীমার হিসাব নিম্নলিখিত রূপে দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য ইহা নূতনতম সংগৃহীত বীমার হিসাব :—

নূতন ইস্যুকরা বীমা পত্র—১,২৫,০০০

নূতন জীবনবীমার পরিমাণ—২৩½ কোটী টাকা

নূতন বাৎসরিক প্রিমিয়াম আয়—১ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা

এই নব সংগৃহীত কাজের মধ্যে ভারতীয় বীমা কোম্পানীর ভাগে কতটা আসিয়াছে তাহা নিম্ন প্রদত্ত হিসাব হইতে বোঝা যাইবে,—

ইস্যুকরা বীমাপত্র—১৭,০০০

জীবনবীমার পরিমাণ—১৭ কোটী টাকা

বাৎসরিক প্রিমিয়াম আয়—প্রায় ৮৯ লক্ষ

উপরি উক্ত নূতন সংগৃহীত কাজের মধ্যে ব্রিটিশ কোম্পানীগুলি ৩½ কোটী টাকার, উপনিবেশ ও কলোনিয়াল কোম্পানীগুলি ৬ কোটী টাকার এবং একটীমাত্র জার্ম্মাণ কোম্পানী প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকার নূতন কাজ সংগ্রহ করিয়াছে। ভারতীয় কোম্পানীগুলির প্রত্যেকটি নূতন বীমাপত্রের গড়্‌পড়তা বীমার পরিমাণ ১,৭৬৪৲ টাকা এবং বিদেশী কোম্পানীগুলির প্রত্যেকটী নূতন বীমা পত্রের গড়পড়তা বীমার পরিমাণ ৩,৪০০৲ টাকা। ইহা হইতে স্বতঃই বোঝা যায় যে যাঁহারা বিদেশীয় কোম্পানীতে বীমা করেন তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা বহুল পরিমাণে স্বচ্ছল ও তাঁহারা প্রায় সকলেই পদমর্য্যাদাশীল। ইহা আমাদের তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মানসিক দৈন্যের অব্যর্থ প্রমাণ।

১৯৩১ সনের শেষ তারিখে ভারতে ৭,১৪,০০০টী বীমা-পত্রে বোনাস সহ ১৬৮ কোটী টাকার বীমাপত্র চলতি ছিল। ইহাদের বাৎসরিক প্রিমিয়াম আয় সাড়ে আট কোটী টাকা। ইহাদের মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীগুলির বীমাপত্রের সংখ্যা ৫,০২,০০০ এবং বীমার পরিমাণ ৯৪ কোটী টাকা ও প্রিমিয়াম আয় ৪॥০ কোটী টাকা।

ভারতীয় জীবনবীমা কার্য্যের প্রসার ও কোম্পানীর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ভারতীয় জীবনবীমা-কোম্পানী ভারতের বাহিরে কার্য্য সম্প্রসারণ করিয়াছে। এই কাজের বেশীর ভাগ ব্রিটীশ পূর্ব্ব আফ্রিকা এবং প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে আসে। এই সকল কোম্পানী ১৯৩১ সনে ভারতের বাহিরে যত টাকার বীমা প্রদান করিয়াছে তাহার পরিমাণ ৬৬ লক্ষ টাকা এবং ইহা বাবৎ প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ

৪ লক্ষ টাকা। ১৯৩১ সনের শেষে বোনাস সহ এই ধরণের ৪ কোটী টাকার বীমা পত্র চল্‌তি ছিল এবং তাহাদের বার্ষিক প্রিমিয়ম আয় ছিল ২১৯ লক্ষ টাকা।

এই দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনেও ভারতীয় কোম্পানীগুলি কাজ সংগ্রহে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে। ইহার কারণ অনেকটা এই যে যে-কাজগুলি বিদেশী কোম্পানীর হাতে যাইত আজ তাহা স্বাদেশিকতার জন্য হউক বা আমাদের নবগঠিত অর্থ নৈতিক স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্যই হউক, বহুল পরিমাণে দেশীয় কোম্পানী গুলিতে আসিতেছে। সুতরাং কাজ সংগ্রহ ব্যাপারে ভারতীয় কোম্পানীগুলি দেশের দুর্দ্দশার ব্যাপকতা অনুপাতে মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ১৯৩১ সনে ভারতীয় কোম্পানীগুলির সংগৃহীত নূতন মোট কাজের পরিমাণ ১৭৸০ কোটী টাকা। ইহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা প্রায় সোয়া কোটী টাকার অধিক কাজ সূচনা করিতেছে। নিম্ন-লিখিত সংখ্যানুবৃত্তি দৃষ্টে ১৯২২ সন হইতে ভারতীয় জীবনবীমার নূতন কাজের পরিমাণ ও মোট বীমার পরিমাণ বৃদ্ধির একটা হিসাব পাওয়া যাইবে :—

বৎসর	নূতন বীমার পরিমাণ	বর্ষ শেষে মোট চল্‌তি বীমা কোটী টাকায়
১৯২২	৫,৬৪	৩৭ কোটী টাকা
১৯২৩	৫,৮৫	৩৯ " "
১৯২৪	৬,৮৯	৪২ " "
১৯২৫	৮,১৫	৪৭ " "
১৯২৬	১০,৩৫	৫৩ " "
১৯২৭	১২,৭৭	৬০ " "
১৯২৮	১৫,৪১	৭১ " "
১৯২৯	১৭,২৯	৮২ " "
১৯৩০	১৬,৫০	৮৯ " "
১৯৩১	১৭,৭৬	৯৮ " "

বর্ত্তমান সময়ে জীবন বীমা ব্যবসায়ের প্রধান বিপদ হইতেছে বাতিল বীমার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। অপেক্ষাকৃত নূতন কোম্পানীগুলি এবং যে সকল কোম্পানী তেমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, তাহাদের মোট কাজের একটা বিপুল অংশ অল্প দিনের মধ্যেই বাতিল হইয়া যায়। সুতরাং বৎসরের শেষে ইহাদের চল্‌তি কাজের পরিমাণ অনেকটা কমিয়া যায়। ১৯৩১ সনে ৭৯ কোটি টাকা বীমাপত্র বাতিল হইয়া যায়; ইহা মোট নূতন সংগৃহীত বীমার ৪০% । মোট চল্‌তি বীমার অনুপাতে ১৯৩১ সনে যে হারে বীমাপত্র বাতিল হইয়াছে নিম্নতালিকায় তাহার একটা স্থূল হিসাব দেওয়া গেল; ১৯৩২ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোম্পানীর স্থিতিকালের তারতম্য হিসাবে কোম্পানীগুলি সাজান হইয়াছে।

কোম্পানীর স্থিতিকাল	১৯৩১ সনে বাতিল বীমার পরিমাণ
৩০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল	৬'৫
২০ বৎসরের বেশী কিন্তু ৩০ বৎসরের কম	৯
১০ " " ২০ " "	১৪'৩
৫ " " " ১০ " "	১৬'৫
৫ বৎসরের কম	৩০

জীবনবীমা কোম্পানীর গচ্ছিত টাকা নানারূপ লাভজনক পথে লগ্নী করা হয়। এই লগ্নীটাকার সুদ দ্বারা কোম্পানীর ভাণ্ডার ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ নিরাপত্তা ও সুদের পরিমাণ হিসাব করিয়া টাকা নানারূপ বিভিন্ন প্রকারে খাটান হয়। ১৯৩১ সনে জীবনবীমা তহবিলের দাদন হইতে শতকরা প্রায় ৫॥০ হারে সুদ পাওয়া গিয়াছে। গত দশ বৎসরে ভারতীয় কোম্পানীগুলি যে হিসাবে সুদ উপার্জ্জন করিয়াছে নিম্নে তাহা দেওয়া হইল,—

বর্ষ	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১
শতকরা সুদের হার	৫'৯৬	৬'২৫	৪'৯৩	৫'৭০	৫'৭০	৫'৫৬	৫'৩৫	৫'৪৯	৫'৪৪	৫'৪২

ভারতীয় জীবনবীমাক্ষেত্রে আজকাল বিপুল প্রতিযোগিতা চলিতেছে। বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত দেশী কোম্পানীর ও দেশী কোম্পানীর সহিত দেশী কোম্পানীর প্রতিযোগিতা যেরূপে একদিকে জীবনবীমার প্রসার ঘটাইতেছে তদ্রূপ তাহা কাজসংগ্রহের খরচের মাত্রাটাও বাড়াইয়া দিতেছে। জীবনবীমার কার্য্য অনুপাতে খরচের কম হার সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মপদ্ধতি সূচনা করে। নিম্ন প্রদত্ত সংখ্যালিপি পাঠ করিলে দেশীয় কোম্পানীগুলি মোট আয়ের কত অংশ ব্যয় করিয়াছে তাহা জানা যাইবে :—

বৎসর	শতকরা খরচের হার	বৎসর	শতকরা খরচের হার
১৯১৩	১৮'০	১৯২৩	১৯'৬
১৯১৪	১৭'৪	১৯২৪	২০০
১৯১৫	১৬'০	১৯২৫	২১'১
১৯১৬	১৫'৯	১৯২৬	২১'৭
১৯১৭	১৫'৫	১৯২৭	২০'০
১৯১৮	১৬'৩	১৯২৮	২৪'২
১৯১৯	১৮'৮	১৯২৯	২৪'০
১৯২০	২০'১	১৯৩০	২৩'৩
১৯২১	১৯'৫	১৯৩১	২৪'০
১৯২২	২০'১		

আজ [illegible] দিকে জাতীয় জীবনে বান ডাকিয়াছে। আজ বহুদিন পরে আমরা ঘরের পানে ফিরিয়া তাকাইতেছি। নিজের দেশের জিনিষ আজ আমাদের সস্নেহ সমর্থন ভিক্ষা করিতেছে। রাষ্ট্রীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রধান সোপান হিসাবে অর্থ নৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ জাতীয়-জীবনের একটি বিশিষ্ট প্রয়োজন। আজ এ স্বাদেশিকতার দিনে আমরা যদি বীমা ক্ষেত্রে এই সহজ সত্যটুকুর মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারি তবেই আমাদের ঘরের দুঃখের জন্য পরের সহানুভূতি ও সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে না।

তথ্য ও সত্য

১। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা—৩৫২৮৩৭৭৮০ ; সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ।

২। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে শতকরা প্রায় ১০ জন অর্থাৎ ৩৩৮৯৫২৯৮ জন বাড়িয়াছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ২৮ জন বাড়িয়াছে।

৩। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা চীনের লোকসংখ্যা অপেক্ষা অধিক।

৪। সেন্সাস কমিশনারের মতে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি "সন্তোষজনক" নহে—আতঙ্কজনক। ভবিষ্যতে শিশুপ্রদর্শনীগুলিতে জন্মনিরোধের উপদেশ দেওয়া উচিত।

৫। ভারতবর্ষে ২৪০০০০০০০ হিন্দু, ৭৮০০০০০০ মুসলমান, ১২৮০০০০০ বৌদ্ধ, ৬৩০০০০০০ খৃষ্টান, ৪৩০০০০০ শিখ ও ১২৫০০০০ জৈন বাস করে। ইহা ছাড়া আদিম জাতির লোক বাস করে ৮২৫০০০০০ জন।

৬। উপভাষা বাদ দিলে, ২২৫টি কথা ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে।

আর্থিক দুর্য্যোগে আমেরিকা

শ্রীসুধাংশু রায়, এম্, এ

চারি বৎসর পূর্ব্বে এই বিরাট অর্থসঙ্কটের প্রাক্কালে পৃথিবীর অর্থনৈতিক কেন্দ্র সমূহ ইহা ভাবিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল যে মহাযুদ্ধের পর হইতে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা প্রচলনে যে বাধা ছিল অবশেষে তাহার একটা মীমাংসা হইয়া গেল। আর্থিক জগতে এক চীনই রৌপ্যকে তাহার মুদ্রার মানরূপে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য সমস্ত প্রধান প্রধান দেশেই স্বর্ণমান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মুদ্রার একটা আদর্শ মান নিরূপিত না থাকায় এতদিন বিভিন্ন দেশের ভিতর অর্থ বিনিময়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা ছিল না। একই মুদ্রার দেশভেদে এবং কখনও বা কালভেদে নানারকম মূল্য ধার্য্য করা হইত। মুদ্রার মান ঠিক হওয়ায় এইরূপ আশাও অনেকের মনে উদিত হইয়াছিল যে অর্থের উপর ভিত্তি করিয়া শীঘ্রই আন্তর্জ্জাতিক মিলন সাধন সম্ভবপর হইবে। এই কারণে ইহাও অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে বিভিন্ন দেশের শুল্কের হার বৃদ্ধিপাওয়াও সম্ভবতঃ দমন করা যাইবে এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তার অগ্রগতিও, যাহা ইউরোপের অনেক দেশে চেষ্টা করা হইতেছিল, রুদ্ধ করা যাইবে।

আজকাল অনেক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমূহ এই বিষয়ে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে রাজনৈতিক দিক হইতে রাষ্ট্রীয় মিলন সাধন লইয়া যেমন League of Nations গঠিত হইয়াছে, সেইরূপ অর্থনীতির দিক হইতেও এইরূপ একটী মিলন অচিরেই সম্ভবপর হইবে। ফলে এক দেশের পণ্য এবং অর্থ স্বাধীনভাবে অন্যদেশে পাঠাইতে আর কোন অসুবিধা থাকিবে না। কিন্তু এই সুবিধাটা উনবিংশ শতাব্দীর আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছিল।

ইহা সত্য যে, যে-অবস্থায় স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে এক দেশের সহিত অপর দেশের যথেষ্ট অসমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। অনেক দেশে—যেমন ইংলণ্ডে, মুদ্রার বহুল পরিমাণে হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রার মূল্যও মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে মাত্রায় ফিরিয়া গিয়াছে। আবার জার্ম্মেনীর ন্যায় কোন কোন দেশ সম্পূর্ণ নূতন নিয়মে স্বর্ণমান গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে—যাহাতে মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের বর্দ্ধিত ধনরাশির চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে। সাময়িকভাবে বেকার সমস্যায় ক্লিষ্ট হইয়া এবং অর্থের অপসারণ বর্দ্ধিত করিয়া স্বর্ণমানকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তথাপিও ১৯২৯ সালে প্রায় সমস্ত অর্থনীতিবিদগণই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে আর্থিক দুর্য্যোগের বুঝি অবসান হইয়া গেল এবং স্বর্ণমান যখন নিশ্চিত তখন কোন দেশ কি মাত্রায় বা কি ভাবে ইহাকে গ্রহণ করে—তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ১৯৩৩ সালে মার্কিন ডলারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্ণমানের পুনরুদ্ধারের আশা একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। চলতি বৎসরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ডলার স্বর্ণের প্রতীকরূপে সগৌরবে বিরাজ করিতেছিল। আমেরিকার মুদ্রার এই শোচনীয় পরিণতির জন্য বিশ্বের আর্থিক বিপ্লব হইতেও তাহার ঘরোয়া ব্যবসা-বিপর্য্যয়ই অধিকতর দায়ী। শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস, যন্ত্রপাতির অতি ব্যবহার ও বেকারের বাড়তি—বিশেষতঃ মার্কিণ ব্যবসায়িদের Speculative excess আমেরিকার ধন দৌলতে ঘাটতি জন্মাইয়াছিল। জগতের অর্থনীতির সুবন্দোবস্ত করিতে হইলে আমেরিকার নূতন প্রেসিডেণ্ট ডলারের মূল্য হ্রাস করিবার যে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতেছেন তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কতকগুলি ইউরোপীয় দেশ, যেখানে স্বর্ণমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সন্দেহ করিতেছে যে আমেরিকার মতলব তাহার পণ্য রপ্তানির প্রসার। কিন্তু এ কথা অবিশ্বাস করিলে চলিবে না যে আমেরিকার উৎপন্নকারিগণ তাহাদের উৎপাদন খরচ এবং ডলারের আন্তর্জ্জাতিক মূল্য হ্রাসের অনুপাতে তাহাদের পণ্য মূল্য বাড়াইতে প্রাণপণ চেষ্টা

করিতেছেন—ফলে মার্কিণ শাসন তন্ত্র এই ভয় করিতেছেন যে Speculatorsগণ অন্তর্বাণিজ্যের মূল্য এত উচ্চে উঠাইতে পারে যেখানে স্বদেশের ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাগাল পাইবে না। সরকারের অনুমোদিত উপায়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাই একযোগে পণ্যের মূল্য, মজুরের মাহিনা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে যাহাতে এই আশঙ্কা দূর হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই রুজভেল্ট "Industrial Recovery Act" জারী করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত দেশগুলি রুজভেল্টের এই মুদ্রা সঙ্কোচ নীতির এত দূর বিরোধিতা করিয়াছে যাহাতে লণ্ডনে বিশ্ব-দৌলত বিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন বিফল হইয়া গিয়াছে। কারণ যাহারা স্বদেশের মূল্যহারের স্থির পরিস্থিতিকে আদর্শ করিতে চাহিতেছেন—তাহারা ব্যবসা ও বাণিজ্যের আশু প্রসারই চাহিতেছেন—আয় ও ঋণের সহিত মূল্যের অবস্থার equillibrium স্থাপন করিয়া। যদিও গত জুলাই মাস পর্য্যন্ত আমেরিকায় ব্যবসার উন্নতি অসম্ভবরূপে দেখা গিয়াছিল তবুও একথা ভুলিলে চলিবে না যে মুদ্রা অপসারণ নীতির সাফল্য ক্রয়ের চাহিদার সম্প্রসারণের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আর্থিক সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমেরিকা যে অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহার ভালমন্দ বিচার করিবার সময় এখনও হয় নাই। এক অজানিত অর্থনৈতিক সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে রুজভেল্ট তাঁহার সঙ্কল্প পরিস্ফুট বা বক্তব্য সমাপ্ত করেন নাই। পৃথিবীর অর্থনৈতিকগণ এবং ধনিক ও বণিক সম্প্রদায় আশা ও নিরাশার মধ্যে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছে। আন্তর্জ্জাতিক স্বর্ণমাণের পুর্নপ্রতিষ্ঠা কোন কালেই সম্ভব হইবে কিনা বলা কঠিন, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে কোনরূপ আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থাতেই যে মার্কিণ রাষ্ট্র রাজী হইতে পারে না—তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

৭। মধ্যপ্রদেশে মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—হাজার করা সাড়ে তেত্রিশ জন। আসামে সর্ব্বাপেক্ষা কম—হাজার করা ২৩৮ জন।

৮। ব্রহ্মে শতকরা ১১-৩ জনের বয়স ৫০ এর উপর। এই প্রদেশে শিশুমৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা কম—শতকরা ২-৩ জন।

৯। বঙ্গদেশে বিধবা বেশী—প্রতি হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ২২৬ জন।

১০। ব্রহ্মে উন্মাদের সংখ্যা বেশী—প্রতি দশ হাজারে ৮৭৭ জন। আজমীড়ে অন্ধের সংখ্যা বেশী প্রতি দশ হাজারে ৩-৮৬ জন।

১১। সমগ্র ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা ২৮১৩১৩১৫ জন অর্থাৎ শতকরা ৮ জন। ১৯২১ হইতে ১৯৩১ এর মধ্যে ১ জন বাড়িয়াছে। ব্রহ্মে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—হাজার করা ৩৬৮।

১২। সন্তানধারণযোগ্য বয়সের হিন্দু বিধবার সংখ্যা ৮৩১৩৭৭৩। সেন্সাসের কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস ১২৫০০০০ জন জন চৌদ্দ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বিবাহিতা বালিকা সর্দ্দা আইনের ভয়ে নিজদিগকে অবিবাহিতা বলিয়া লিখাইয়াছিল।

১৩। বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানে প্রতি বর্গমাইলে ৩২২৮ জন লোক বাস করে; ইংলণ্ডে প্রতি বর্গমাইলে ৬৮৫, চীনে ৮০৫।

১৪। শতকরা এগার জন অর্থাৎ ৩৯০০০০০০ জন সহরে বাস করে। ভারতবর্ষে ২৫৭৫টি সহর ৬৯৬৮৩১টি গ্রাম এবং ৭১০৬২২২৮ খানি বাড়ী আছে।

বৈদেশিকী

আমেরিকা

জাতীয় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে বর্ত্তমান আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকগুলি মূলগত কথা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবনের যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ইহার স্থাপয়িতাগণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছিল—তাহা কি রুজভেল্ট নীতির আঘাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে—ইহাই হইল এখন আমেরিকার অর্থতাত্ত্বিকগণের প্রশ্ন। ইয়ুরোপের কতগুলি রাজ্যে যে "সংঘবাদ" প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে আমেরিকা কি শেষে সেই নীতিই গ্রহণ করিবে? অথবা আমেরিকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থনীতি কি এতই দৃঢ় সংবদ্ধ যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের শত আঘাতেও তাহার ভিত্তি শিথিল হইবার সম্ভাবনা নাই? আমেরিকার সমাজতন্ত্রবাদের কি কোন ভবিষ্যৎ নাই? এই সমস্ত প্রশ্নগুলি আজ আমেরিকার অবস্থা আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে উদিত হয়।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অর্থনৈতিক সংস্কার তন্ত্রের একটা বিশিষ্ট দিক জনসাধারণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। রুজভেল্ট-পরিকল্পিত "ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেড্ রিকভারি এ্যাক্ট" আমেরিকার বাণিজ্যের অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন আনিবার জন্য মূল্যবৃদ্ধি, বেতন বৃদ্ধি এবং মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে। এই আইন অনুসারে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(১) বেতনভুক্ কর্ম্মচারীগণ সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা চুক্তিবদ্ধ কার্য্যের জন্য আলাপ আলোচনা করিতে পারিবেন এবং এই কার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ বাধা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

(২) কোন কর্ম্মচারী তাহার চাকুরীর জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসা-সংঘে যোগদান করিতে বাধ্য থাকিবে না এবং কোন সংঘের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতেও বাধা প্রাপ্ত হইবে না।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির স্বরূপ বিবেচনা করিলে ইহা স্বতঃই অনুমিত হইবে যে ১৯১৭ সন হইতে অদ্যাবধি ট্রেড্ ইউনিয়নগুলিকে এতটা স্বাধীনতা কখনও দেওয়া হয় নাই যতটা দেওয়া হইয়াছে NIRA প্ল্যানে। আমেরিকার ট্রেড্ ইয়ুনিয়ন আন্দোলন চিরদিনই ক্ষীণস্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল। এমন কি বিংশ শতাব্দীর এই আরম্ভোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন-মুহূর্ত্তেও ইহার যে অগ্রগতি তাহা ইংলণ্ডের গত শতাব্দীর আন্দোলনের মতও বলশালী নয়। ইহার কারণ আবিষ্কার করা সুকঠিন নহে। আমেরিকায় অধুনাপ্রচলিত শ্রেণীবাদ কখনই সুপরিস্ফুট হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। ক্ষুদ্রতম শ্রমিকের জীবন হইতে বিরাট ব্যবসায়ের কোটীপতি অধিস্বামী হইবার কাহিনী আমেরিকার ব্যবসাবাণিজ্য জগতে বিরল নয়। এই নিমিত্ত আমেরিকার ট্রেড্ ইয়ুনিয়নের ইতিহাসে নেতৃত্বের অভাব সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের ট্রেড্ ইয়ুনিয়নের গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে নেতৃত্বের অসামান্য পরিচালন শক্তিতেই ইংলণ্ডের ট্রেড্ ইয়ুনিয়ন আন্দোলন সুগঠিত ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড্ ইয়ুনিয়নগুলির শক্তিহীনতার আর একটী কারণ এই যে ইহারা ইহাদের কর্ম্মীবৃন্দের উপর এতটা স্বাধিকার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে যে তাহার ফলে এই সংঘগুলিতে স্বেচ্ছাচারিতা ও পর্ব্বত প্রমাণ ক্লেদের বোঝা চাপিয়া বসিয়াছে। এদিকে ১৯২৩-২৯ সন ব্যাপিয়া বাণিজ্য জগতে যে একটা

প্রাচুর্য্যের হাওয়া দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে ট্রেড্ ইউনিয়নগুলির সভ্যসংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। শিল্পবাণিজ্যে উৎপাদন পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়াতে শ্রমিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের হার বাড়িয়া গিয়াছিল। শ্রমিকদলের মধ্যে যাহারা ধনী, এমন কি শ্রমিক শ্রেণী পর্য্যন্তও ধনিক অর্থতন্ত্র বরণ করিয়া লইয়াছিল। এই সময়ে আমেরিকার শিল্পজগতে একটা কেন্দ্রবিভাগনীতি অনুসরণ করা হইতেছিল। এই নীতির মূলে ছিল সরবরাহের সুবিধা। ইহাতে দক্ষিণস্থ রাজ্যগুলিতে ক্রমশঃই শিল্প অভিযান হইতেছিল, কারণ ঐ সকল স্থানে শ্রমিকের পারিশ্রমিক হার সুলভ ও ততটা ট্রেড্ ইয়ুনিয়ন-বদ্ধ নহে।

এদিকে ফ্যাক্টরীগুলিতে যে শ্রমিক উপানবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সর্ব্বদাই জনপূর্ণ থাকে, কারণ মোটরের দরুণ সরবরাহের সুবিধা বিধায় কেহই আর সেই সকল উপনিবেশ ছাড়িয়া যাইতে রাজী হয় না। এই সমস্ত কারণে আমেরিকার ট্রেড্ ইউনিয়নগুলি আর বলশালী হইয়া উঠিতে পারিল না। চতুর্দ্দিকের শ্রমিক আবহাওয়া দেখিয়া ধনিকগণ ক্রমশঃই সাবধান হইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; ইহার ফলস্বরূপ বর্ত্তমানে আমেরিকায় Welfare Capitalism অর্থাৎ "সংস্কারশীল ধনিক বাদ" ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে। ধনিক-শ্রেণী এখন শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট; ইহার কারণ ধনিক শ্রেণী চাহিতেছে যে শ্রমিক শ্রেণীর যদি তাহাদের কল কারখানার উপর একটা মমত্ব বোধ জন্মে তাহা হইলে তাহারা কোনরূপ বাহিরের সংঘে যোগদান করিবে না। এইরূপে বাহিরের আকর্ষণ হইতে যদি শ্রমিকশ্রেণীর আকর্ষণ অন্তর্মুখী হয় তবে তাহাদের ট্রেড্ ইউনিয়নে যোগদান করিবার ইচ্ছা ক্রমশঃই শিথিল হইয়া যাইবে। প্রত্যেক কারখানায় এখন শ্রমিকগণের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগের তদন্তের জন্য একটী "ব্যক্তিগত বিভাগ" গঠিত হইয়া উঠিতেছে; ইহাতে শ্রমিকগণের অভাব-অভিযোগের-কাহিনী চতুর্দ্দিকে ঢক্কানিনাদ সহকারে প্রচারিত হইবার সুযোগ পায় না। বর্ত্তমানে প্রত্যেক কারখানায় এক একটী "কোম্পানী ইউনিয়ন" গঠিত হইয়া উঠিতেছে এবং এই ইউনিয়নে শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্ব বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। ফলে কোন বাহিরের সংঘে যোগদান না করিয়া শ্রমিকদল নিজ নিজ ফ্যাক্টরীর ইউনিয়নে যোগদান করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছে। নিম্নলিখিত সংখ্যা বিবৃতি পাঠে কিরূপে ট্রেড্ ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে তাহা বোঝা যাইবে;—

বৎসর	আমেরিকায় ট্রেড্ ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা
১৯২০	৫,১১১,০০০
১৯২৩	৩,৭৮০,০০০
১৯৩২	২,৫০০,০০০

N. I. R. A. আইনের ৭নং ধারায় ইহা বলা হইয়াছে এই প্ল্যানের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে শ্রমমূল্য বৃদ্ধির উপর এবং এই শ্রমমূল্য সংঘবদ্ধ ক্রয় বিক্রয়ের সার্থকতার উপর ভিত্তিবদ্ধ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমেরিকার- ট্রেড ইউনিয়ানের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সেখানকার ধনিক সম্প্রদায় আরম্ভ করিয়াছে তাহা সেদেশের সাধারণ শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন লাভ করিয়াছে। ইহার ফল যে অদূর ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা বলা মুস্কিল। অনেকে সন্দেহ করেন যে ইহার ফলে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইবে এবং ধনিকশ্রমিকে দ্বন্দ্ব আরও বাড়িয়া যাইবে।

জার্ম্মেনী

বর্ত্তমান নাজি গভর্ণমেণ্ট গত সেপ্টেম্বর মাসে যে আইন দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন তাহার প্রধান স্বরূপ নিম্নরূপ :—

সরকার বর্ত্তমানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির গৃহসংস্কারের খরচের একপঞ্চমাংশ সরকারী তহবিল হইতে দান করিবে। গভর্ণমেণ্ট সাহায্যের শেষ পরিমাণ ৫০০০ লক্ষ মার্ক স্থিরীকৃত হইয়াছে। অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশের জন্য অল্প হারে ঋণ দেওয়া বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বেকার সমস্যা মীমাংসার্থ হার হিট্‌লারের প্রবর্ত্তিত ইহাই দ্বিতীয় আইন। প্রথম আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে গত জুন মাসে। The Economist পত্রিকার বার্লিনস্থ সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে নাজি-গভর্ণমেণ্ট একটী কৃষি আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সমগ্র কৃষিবিভাগটী কৃষিমন্ত্রীর অধীনে আনা হইয়াছে। কৃষিমন্ত্রী বিভিন্ন কৃষির পরিমাণ বিবেচনায় তাহার উৎপন্ন জিনিষের রকম নির্দ্ধারণ করিবেন, এমন কি কেনা বেচার দাম নির্দ্ধারণও তাহার উপরই ন্যস্ত থাকিবে। গভর্ণমেণ্ট

দামের হার বর্ত্তমানে বেশী বাড়াইবার পক্ষপাতী নহে। উক্ত পত্রিকার মতে শুল্ক আইন রচনা দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে আমদানী বন্ধ করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি স্থলে আংশিক ভাবে আমদানী শাসন করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য যে সকল দেশ জার্ম্মানীর সহিত কোনরূপ বাণিজ্য সম্বন্ধে বন্ধ না হইয়াই বাণিজ্য প্রাচীর খাড়া করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধেই উপরোক্তরূপ আইন ব্যবহার করা হইবে।

গত ২৮শে অক্টোবর বার্লিন হইতে বিশ্বদূত রয়টার সংবাদ দিতেছে যে জার্ম্মানীর বৃহত্তম চারিটী প্রতিষ্ঠান—কয়লা ও ইস্পাত ব্যবসা চুক্তীকৃত করিবার জন্য একটী বিরাট পরিকল্পনা আলোচনা করিতেছে। এই কোম্পানীগুলির নাম The Vereinigte Stahlwerke, Phoex Mining Vanderipen এবং Wissn Svelting; ইহাদের অংশীকৃত মূলধন যথাক্রমে ৩৮,৭৫০, পাউণ্ড ৮,৫০০,০০০ পাউণ্ড এবং ৮১০,০০০ পাউণ্ড। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে অংশগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড। ইহাদ্বারা খরচের হার কমিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এদিকে উপরোক্ত ব্যবসাগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট ১২টী স্বাধীন বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে এবং ইহারা ইহাদের বিশিষ্ট কর্ম্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিবে। উপরোক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরা করিবার জন্য অংশীদারগণ ২৯শে নভেম্বর এমেন সহরে সমবেত হইবেন।

গ্রেট ব্রিটেন

কানার্ড ও হোয়াইট ষ্টার লাইন নামক দুইটী অতিকায় ব্রিটীশ কোম্পানীর কার্য্য এক করিয়া দিবার জন্য যে ঘরোয়া বন্দোবস্ত হইতেছিল তাহার সমস্ত তোড়জোড় শেষ হইয়াছে শুনা যাইতেছে। এই বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা উত্তর আটলাণ্টিকের জলযানে গতায়াতের একটীমাত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা। এই সুসংবদ্ধ কোম্পানী দুইটী এক হইয়া গেলে ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম জাহাজ কোম্পানী বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহার মূলধন হইবে ২৩,০০০,০০০ পাউণ্ড ও ইহারা প্রায় ১,৫৯০,০০০ টনের কারবার পরিচালন করিবে। নৌবাণিজ্যে অদ্বিতীয় ইংলণ্ড ভিন্নদেশীয় জাহাজ কোম্পানীর তীব্র প্রতিযোগিতায় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। বিগত ৭ই নভেম্বর পি এণ্ড ও কোম্পানীর সভাপতি মিঃ এলেকজাণ্ডার শ' এক সভায় তাহার স্বদেশবাসীদিগকে ব্রিটীশ নৌবাণিজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণার্থ দৃঢ় সংকল্প হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই উপদেশের ফলস্বরূপ যে কানার্ড ও হোয়াইট ষ্টার লাইন নামক যাত্রী সরবরাহী কোম্পানী দুইটী এক হইয়া যাইতেছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে বিলাতে বেকারের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে। অক্টোবর মাসে বেকারের সংখ্যা ছিল সর্ব্বসমেত ২,২৯৮,৭৪৩ জন; এই সংখ্যা বিগত মাস হইতে ৩৭,৯৭৪ এবং গত বৎসরের এই মাস হইতে ৪৪৮,২৫৩ জন কম। এতদ্দৃষ্টে বোঝা যায় যে বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমশঃই উন্নতির দিকে যাইতেছে। অর্থনৈতিক বয়কট যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে আজকাল পৃথিবীর রাষ্ট্রবিদ্‌গণের অনেকেই নিঃসন্দেহ। বিগত ৫ই নভেম্বর ১,৫০,০০০ ইহুদীর একটী প্রতিনিধিমূলক সম্মেলনে সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে যে-পর্য্যন্ত জার্ম্মেনীর ইহুদীগণ তাহাদের নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত না হইবে সে পর্য্যন্ত তাহারা কোনপ্রকার জার্ম্মাণ-প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবে না। অধিকন্তু তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহুদীগণকে তাহাদের প্রণালী গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছে।

গত বিশ্বঅর্থনৈতিক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ পরস্পর যে শুল্ক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে অধুনা গ্রেটব্রিটেন তাহার বিপক্ষে তীব্র মত প্রকাশ করিতেছে। গত ৭ই নভেম্বর ব্রিটীশ পার্লামেণ্টে বোর্ড অফ্ ট্রেডের সভাপতি মিঃ ওয়াল্টার রুশিমেন ঘোষণা করিয়াছেন যে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের মতে এই শুল্কসন্ধির প্রয়োজন নাই বলিয়া অনুভূত হইতেছে; সুতরাং আগামী ডিসেম্বর মাস হইতে গ্রেটব্রিটেন এই সন্ধিসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবে।

বিগত ৭ই নভেম্বর ভারত সচিব ১৯৫৪—৫৯ সনের ষ্টক স্বরূপে ১০০ লক্ষ পাউণ্ডের ট্রাণ্ডি ঋণের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঋণের ইস্যু মূল্য শতকরা ৯৭ পাউণ্ড; এই ষ্টকের সুদ বৎসর ৩½%। এই ঋণ ১৯৩৩-৩৪ সনের ১০০ লক্ষ পাউণ্ড ৬% বণ্ডের বদলে ইস্যু করা হইয়াছে। এই ঋণের চাঁদা খোলা হওয়ার পঁচিশ মিনিটের মধ্যে গৃহীত হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনে ইঙ্গ জাপানী বাণিজ্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথাবার্ত্তা আরম্ভ হওয়ার ভূমিকা স্বরূপ জাপান ও ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্রশিল্প প্রতিনিধিগণ ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত তিন দিনব্যাপী আলোচনা চালাইয়াছিলেন। এই আলোচনার স্থান ছিল ম্যাঞ্চেষ্টার। এই আলোচনায় উভয় পক্ষই পরস্পর শিল্প ব্যবসায়ে সহযোগিতা ও উন্নতি বিষয়ে একটা নিষ্পত্তি করিবার প্রয়াস পান। গত ৮ই নভেম্বর জাপানী প্রতিযোগিতার স্বরূপ এবং বস্ত্রব্যবসায়ে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য বোর্ড অফ্ ট্রেডের সভাপতি মিঃ ওয়াল্টার রুশিম্যান ব্রিটীশ বস্ত্রব্যবসায়ের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত একটা ঘরোয়া আলাপ আলোচনা করেন। ল্যাঙ্কাসায়ারের প্রতিনিধিগণ এই বিষয়ে মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যের সহিতও আলোচনা চালাইতেছেন। ভারতে ল্যাঙ্কাসায়ারের প্রতিনিধিগণের কার্য্য শেষ হইলেই প্রকৃত আলোচনা আরম্ভ হইবে। পার্লামেণ্টে মিঃ রুশিম্যান স্পষ্টই বলিয়াছেন যে জাপানী জিনিষের অকস্মাৎ আক্রমণ সম্বন্ধে মন্ত্রীসভা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

বিলাতে বর্ত্তমানে বেকার সমস্যা সম্বন্ধে নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা হইতেছে। গত পার্লামেণ্টে গভর্ণমেণ্ট একটী বিল দ্বারা এই দিকে বিপুল সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। এই বিল অনুযায়ী পাঁচজন সভ্য লইয়া একটী "বেকার সাহায্য বোর্ড" গঠিত হইবে; এই বোর্ড স্থানীয় সমস্ত বেকার লোকের দায়ীত্ব গ্রহণ করিবে। এই বোর্ডের কর্ম্মচারীবৃন্দ সর্ব্বদেশব্যাপী বেকার দলের সাহায্য ভার গ্রহণ করিবে ও সে সকল শ্রমিক বেকারবীমা-দ্বারা রক্ষিত নহে তাহাদের ভার গ্রহণ করিবে। বেকারগণের জন্য চিকিৎসার সাহায্য সরকারের হাতেই থাকিবে, কিন্তু তাহাদের অন্যান্য সাহায্য, তাহাদের শারীরিক উপযুক্ততা বিধান প্রভৃতি দায়ীত্ব এই বোর্ডের হাতে থাকিবে। বেকার বীমা স্থায়ীত্ব ২৬ সপ্তাহ হইতে ৫২ সপ্তাহ বাড়ান হইয়াছে। ১৪ বৎসর বয়সে যে সকল বালক বিদ্যালয় ত্যাগ করিবে তাহাদের বীমার সময় ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮ বৎসরের নীচে যে সকল বালক বীমা বদ্ধ নহে তাহাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। এই বেকার বীমা প্রস্তাব কার্য্যকরী ও স্থাবলম্বী করিবার জন্য যে সকল সাময়িক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য একটা স্ট্যাট্যুটারী কমিটী গঠন করা হইবে।

ফ্রান্স

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে দেলেদিয়ার যে আকস্মিক বাজেট চেম্বারে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা ৮৮ ভোটে পরাজিত হওয়ায় মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছে। এই বাজেটে বেতন ও পেন্সনের উপর ইন্‌কাম্ ট্যাক্স ধার্য্য করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। যাহা হউক মন্ত্রীসভার পতনের ফলে যে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে তাহার অধিনায়ক হইলেন মঁসিয়ে এলবার্ট স্যারাউ। এই মন্ত্রীসভা চরমপন্থী মতাবলম্বী, নব নির্ব্বাচিত প্রধান মন্ত্রীর অর্থনীতির উদ্দেশ্য হইবে কর হ্রাস করা ও পূর্ব্বকার্য্যের ব্যবস্থা।

ফরাসী সরকার লীগের সেক্রেটারী জেনেরালকে জানাইয়াছেন যে রাষ্ট্রীয় কারণে ফরাসী সরকার বিশ্বঅর্থনৈতিক বৈঠকে গৃহীত শুল্কসন্ধি মানিয়া চলিতে প্রস্তুত নহে ও ফরাসী সরকার শুল্ক ব্যাপারে তাহার পার্লামেণ্টের নির্দ্ধারণ মানিয়া চলিবার স্বাধীনতা হারাইতে রাজী নহে। সম্প্রতি ইংলণ্ডেও বিশ্বঅর্থনৈতিক সম্মেলন গৃহীত এই শুল্কসন্ধি বাতিল করার জন্য বোর্ড অফ্ ট্রেডের সভাপতি মিঃ ওয়াল্টার রুশিম্যান মত প্রকাশ করিয়াছেন।

অক্টোবর মাসের ২০শে হইতে নভেম্বর মাসের ৩রা পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্সের মজুত সোণার পরিমাণ প্রায় দশলক্ষ ফ্রাঁঙ্ক কমিয়া গিয়াছে। মজুত সোণার পরিবর্ত্তে নোটের পরিমাণ ৭৯'১১% হইতে ৭৯'৬৮% বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ বাজেটের অনিশ্চিত অবস্থা।

ফ্রান্সের নূতন প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে সারাউ একটী ব্যাপক অর্থনৈতিক প্ল্যান কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ফ্রান্সের উপনিবেশগুলির সমগ্র অর্থ একটী জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা-কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করিবেন বলিয়া প্রধান মন্ত্রী আশা দিয়াছেন। মঁসিয়ে সারাউ বর্ত্তমান শুল্ক আইনে বিপুল পরিবর্ত্তন দ্বারা একটী বৃহত্তর জাতীয় অর্থনৈতিক সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। ব্রাজিল ফরাসী দ্রব্যের বিরুদ্ধে যে শুল্ক প্রাচীর খাড়া করিয়াছে অনুরূপ শুল্ক প্রাচীর ফরাসীরাও ব্রাজীলের বিরুদ্ধে স্থাপন করিবে বলিয়া শাসাইতেছে। আমেরিকাকে দেয় যুদ্ধ ঋণ সম্বন্ধে নূতন গভর্ণমেণ্ট অনুসৃত নীতির কোন পরিবর্ত্তন করিবেন না।

নাজি গভর্ণমেণ্টের অর্থনীতি

কিছুদিন পূর্ব্বে জার্ম্মানীর ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার প্রথম অধিবেশন হইয়া গেল। এই অধিবেশনে চ্যান্সেলার হার কেপ্‌লার উপস্থিত থাকিয়া নাজি গভর্ণমেণ্টর অর্থনীতি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন তাহাই হার হিট্‌লারের ব্যক্তিগত মত বলিয়া তিনি জ্ঞাপন করেন। সুতরাং এই বক্তৃতা হইতেই আমরা নাজি অর্থনীতির বনিয়াদ্ বুঝিতে পারি।

হার কেপ্‌লার বলেন যে নাজি দল বুঝিতে পারিতেছে যে দেশের এই তীব্র বিদ্রোহের সময় জাতীয় অর্থনীতির কোনরূপ মূলগত পরিবর্ত্তন মোটেই উচিত নহে। সুতরাং গত সাতমাস যাবৎ ক্ষমতা-সম্পন্ন থাকিয়াও নাজি সরকার জাতীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের দিকে কোনরূপ দৃষ্টিপাত করে নাই। এই ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটী জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক সমূহের আশু সংস্কারের কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু এই কার্য্যে কমিটী নাজী মতবাদ লক্ষ্যপথে রাখিয়াই অগ্রসর হইবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; নাজিদল নেতৃত্ববাদে বিশ্বাস করে, কারণ পৃথিবীতে প্রত্যেক কাজই কাহারও না কাহারো নেতৃত্বে আরম্ভ হয়। ব্যাঙ্কসংস্কার কার্য্যে এই নেতৃত্ববাদই কার্য্যতঃ ফলপ্রসূ হইবে, কারণ জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি এতদিন যাবৎ বহুল পরিমাণে কেন্দ্রীভূত ছিল। ইহার ফলে এই ব্যবসায়ে অত্যন্ত আমলাতন্ত্রী ভাব আসিয়া গিয়াছে এবং ব্যক্তিগত প্রভাব অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এই নিমিত্ত ব্যবসায়ের দুরবস্থার সময় ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের করণীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অপারগ হইয়াছিল। এই জন্য অসংখ্য ম্যানেজিং বোর্ড, পরিদর্শক বোর্ড ও অন্যান্য কমিটীর স্থানে ব্যক্তিগত দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। চ্যান্সেলার হার হিট্‌লারের অনুমোদিত পন্থায় ধনিককে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। জনসাধারণের মঙ্গলই রাষ্ট্রতন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বড় আদর্শ। দেশের আর্থিক দেহ রাষ্ট্রীয় দেহের ভৃত্য স্বরূপ সুতরাং ইহার কর্ত্তব্য জনসাধারণের উচ্চ জীবনযাত্রা পদ্ধতি, কর্ম্মবাদ ও অন্ন নিয়ন্ত্রিত করা। মূলধন এই সকল কার্য্যে দেশের অর্থতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করে। যে সকল প্রতিষ্ঠান শিল্প দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাদের কার্য্যে ব্যাঙ্ক প্রভৃতির ন্যায় ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য প্রয়োজন তাহাদের বিশেষত্বের উপরই নাজিদল নির্ভর করে বেশী। এই সব ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী ক্ষমতা এত ব্যাপক থাকা প্রয়োজন যাহা দ্বারা ব্যক্তিগত প্রয়োজন অপ্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রাখা চলে। এইরূপ সজাগ দৃষ্টি তখনই সম্ভব যখন ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিষ্ঠানগুলির একটা সম্বন্ধ সূত্র থাকে। এইরূপ ব্যবস্থার জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি যেন কেন্দ্রীভূত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ব্যাঙ্কগুলির বর্ত্তমান কেন্দ্রীভূত অবস্থায় ব্যক্তিগত দায়ীত্বভার শিথিল হইয়া গিয়াছে। এই শিথিলতা শুধু ব্যাঙ্কগুলির পক্ষেই প্রযোজ্য নয়, ইহা অন্যান্য নানারূপ শিল্প ব্যবসায়েও প্রযোজ্য। ষ্টেটের এই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন এবং যাহাতে নানারূপ ব্যাঙ্ক ও আর্থিক ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ের প্রবল আর্থিক অসাচ্ছ্যন্দের ফলে এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবগুলিই প্রায় সবরকম ব্যবসায়ে হাত দিয়া জড়াইয়া পড়িয়াছে, ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বহুপ্রকার আর্থিক দায়ীত্ব ঘাড়ে লইতে বাধ্য হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ হার কেপলার জার্ম্মাণীর সেভিং ব্যাঙ্কগুলি যে বৃহৎ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের কাজ করিতেছে তাহার উল্লেখ করেন। তাহার মতে যে সকল মধ্যবিত্ত ও অল্প আয় বিশিষ্ট লোক তাহাদের জীবনের ক্ষুদ্র সঞ্চয় এই সকল ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া ভবিষ্যৎ সুখের দিনের আশায় দিন কাটাইতেছেন—তাহাদের অর্থের নিরাপত্তা বিধান করা প্রত্যেক দায়ীত্বশীল প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য। এই জন্য এই সকল অর্থ সম্পর্কে কোনরূপ বিপদজনক লগ্নীতে হাত দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ব্যাঙ্কের আর একটা কর্ত্তব্য হইতেছে যে স্থাবর সম্পত্তি বিনিময়ে ঋণদান করা। ষ্টেট্‌ব্যাঙ্ক সরকারের অধীনে থাকাই সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন এবং ব্যবসায়ের মন্দার সময়ে জাতীয় শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবার অনুরূপ সামর্থ্য ইহার থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সরকার আর্থিক ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষপাতী নহে এবং ছোট ছোট মহাজনদিগকে যতটা স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব ততটাই ইহা দেওয়া প্রয়োজন মনে করে। সুদের হার কমাইবার সমস্যা সমাধান করিবার পক্ষে কাজ গুলিই যথেষ্ট নহে, কারণ ইহা টাকার বাজারের অবস্থার উপরই বেশী নির্ভর করে। ব্যাঙ্কগুলির খরচের হার আলোচনা করিলে অবশ্য এই বিষয়ে একটা সমাধানের পথ বাহির হইতে পারে। এই সব ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের দূর-

প্রসারী সংগঠন প্রণালী অনেক সময়েই একটা আমলাতন্ত্রবাদের সৃষ্টি করে; ইহাতে যে একটী জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাই অনেক সময় বেশী খরচের কারণ হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কগুলির চতুর্দ্দিকে কর্ম্ম-সম্প্রসারণ সব সময়েই তাঁহাদের কাজের পক্ষে অনুকূল নহে। এইরূপ শাখা ব্যাঙ্ক স্থাপন এবং তাহার ফলে নূতন নূতন কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি অনেক সময়ে খরচের ঘরটা আশঙ্কাজনক ভাবে পরিপূরণ করিয়া থাকে; অনেকগুলি ব্যাঙ্ক লগ্নীব্যাপারে যে রকম বিপদ ঘাড়ে লইয়াছে, তাহা শুধু ফট্‌কাবাজীদের পক্ষেই সম্ভব; ইহাতে অনেক ব্যাঙ্ক যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি যখন খরচের হার কমাইয়া দিবে এবং স্বাভাবিকভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে তখনই গভর্ণমেণ্ট টাকার বাজারে একটা স্বাভাবিক অবস্থা বিধান করিতে চেষ্টিত হইবেন এবং তখনই সুদের হার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময় আসিবে। ষ্টেটের ক্ষমতা যতটা অপ্রতিহত হইবে ততটাই বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন কর্ম্মক্ষমতা দেওয়া যাইবে।

নাজিদল যে জার্ম্মাণীতে এখন অপ্রতিহত ক্ষমতা সম্পন্ন ও সমগ্রজাতির বিশ্বাসভাজন—সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। নাজিদলের চ্যান্সেলারের প্রতিনিধিস্বরূপ হার কেপ্‌লারের বক্তৃতায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এই দল বর্ত্তমান অর্থনৈতিক বনিয়াদকে কোনরূপেই আঘাত করিবে না এবং ইহাকে যতটা সাবধানতার সহিত গঠন করা যায় ততটাই তাহাদের উদ্দেশ্য। আশা করা যায় যে এই দলের অর্থনীতি যদি উপরোক্ত আদর্শ অনুসারে পরিচালিত হয় তবে সমগ্র জার্ম্মাণ জাতির অর্থনৈতিক পরতন্ত্র পুনর্ব্বার সুগঠিত হইয়া উঠিবে অতীতের ভিত্তির উপর।

তথ্য ও সত্য

ভারতের ৩৫টী সহরের লোকসংখ্যা ১০০০০০ এর উপর। ৬৫টি সহরের লোক সংখ্যা ৫০০০০ হইতে ১০০০০০ এর মধ্যে। ২৬৫টী সহরের লোকসংখ্যা ২০০০০ হইতে ৫০০০০ এর মধ্যে।

প্রতি বাড়ীতে গড়ে ৫ জন লোক বাস করে। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৩৯-৩ জন লোক বাস করে।

ভারতে শতকরা ৭১ জন কৃষি ও গবাদি পশুপালন করে। শতকরা ১০ জন শিল্পে নিযুক্ত আছে। শতকরা ৫জন ব্যবসায়ী। শতকরা ১-৫ জনের অন্যান্য উপজীবিকা। শতকরা ১ জন সরকারী কর্ম্মচারী।

২০০০০০ প্রসূতি প্রতি বৎসর সন্তান প্রসবকালে মারা যায়। যাহাদের বালিকা বয়সে বিবাহ হয়, তাহাদের হাজার করা ১০০ জন সন্তান ধারণযোগ্য বয়স অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে—সন্তান প্রসবকালে মারা যায়।

পুরুষের বয়সের গড়—২৩-২ বৎসর। স্ত্রীলোকের বয়সের গড় ২২-৮ বৎসর।

প্রত্যেক প্রদেশে মেয়ে অপেক্ষা ছেলের জন্ম বেশী। জয়পুরে প্রতি হাজার ছেলেতে ৫৩৩টী মেয়ে। প্রতি প্রসূতি গড়ে ৪-২টী সন্তান প্রসব করে, বাঁচে ২-৯টি। প্রতি পরিবারে গড়ে ৪ জন লোক সব সময়ে থাকে।

প্রতি হাজার স্ত্রীলোকের ১৭০ জন বিধবা। তাহাদের ২২ জনের বয়স ৩০ এর নীচে ৪৫ জনের বয়স কুড়ির নীচে।

শতকরা ৪৪ জন খাটিয়া খায়, ৫৬ জন পরের উপরে খায়।

ভারতে গ্রামগুলির দুই তৃতীয়াংশে কোনও বিদ্যালয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় গড়ে ছাত্র প্রতি ১২ শিলিং।

পত্রাবলী

য়ুরোপের পত্র

শ্রীচাণক্য লিখিত

৫

Disarmament Conference সম্বন্ধে দুই একটী কথা ইতিপূর্ব্বে লিখেছি। World Economic Conference যে কারণে কৃতকার্য্য হয়নি, এই Disarmament Conference ও প্রায় সেইরূপ কতকগুলি কারণে ভেঙ্গে গেলো। ভার্সাই সন্ধির ফলে য়ুরোপে অনেকগুলি নূতন গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে য়ুরোপীয় জাতিসমূহের নূতন নূতন দল গঠন আবশ্যক হয়েছে। ফ্রান্স এই সুযোগে এমন ভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে যে তার মিত্রপক্ষ ইংরেজজাতি পর্য্যন্ত তা পছন্দ করছে না। ইটালী সেকথা স্পষ্টই বলেছে এবং ইংলণ্ডে একটী শক্তিশালী দল হয়েছে যাঁরা ফ্রান্সকে আর শক্তিসঞ্চয় করতে দিতে আদৌ রাজি নয়। হিট্‌লার আন্দোলনের ফলে জার্ম্মেনীর যুবকদল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ফ্রান্সকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। একথা মনে রাখতে হবে যে ১৯১৯ সালে ভার্সাই সন্ধি যখন দস্তখত হয় তখন যে সব বালকের বয়স ১০।১১ বৎসর ছিল—তারাই এখন জার্ম্মেণীর যুবকসম্প্রদায়। এদের নিয়ে দল গঠন হয়েছে এবং এককথায় বলতে গেলে জার্ম্মেণীকে একীভূত জার্ম্মেণী (United Germany) করা সম্ভব হয়েছে। শীঘ্রই সেখানকার election হবে এবং তাতে প্রত্যেক জার্ম্মাণকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যে সে হিটলার গবর্ণমেণ্টের নীতির অনুমোদন করে কিনা। আমার মোটেই সন্দেহ নেই যে সমস্ত জার্ম্মাণজাতি এক-বাক্যে তাকে সমর্থন করবে এবং তার ফলে হিট্‌লার গবর্ণমেণ্ট আরও শক্তিশালী হবে। একথা জার্ম্মেণী আর মানতে রাজি নয় যে য়ুরোপের সকল জাতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে এবং দরকার হলে জার্ম্মেণীকে ভয় দেখাবে আর জার্ম্মেণী নির্ব্বিবাদে তাই মেনে চলবে। League Of Nations ছেড়ে দিয়ে জার্ম্মেণী মস্ত বড় চাল দিয়েছে। জাপান ইতিপূর্ব্বেই লীগ্ ছেড়েছে এবং Leagueএর উপর অনেকেরই তেমন আস্থা আর নেই। এখন জার্ম্মেণী লীগ্ ছাড়লে লীগ্‌এর অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। ইংলণ্ড এবং ইটালী খুব চেষ্টা করছে যাতে একটা মীমাংসা হয় এবং ফ্রান্স তার যুদ্ধের আয়োজন কম করে। সকলেই বুঝ্‌তে পারছে যে য়ুরোপের সমূহ বিপদ উপস্থিত এবং সহজে যে এই চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া হবে তা মনে হয় না। কোন রকম একটা আপোষ নিষ্পত্তি না করলে য়ুরোপে আবার যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা আছে একথা সকল জাতিই হৃদয়ঙ্গম করেছে। হয়তো জার্ম্মেণীর এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা য়ুরোপের সমস্যার কোন রকম সমাধান করবে।

Armament সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, আমার মনে এর অর্থনৈতিক দিকটাই বেশি জাগছে। পৃথিবীর এই দুর্দ্দিনে সমস্ত জাতি যখন আর্থিক দুরবস্থার দরুণ মৃতপ্রায়, পৃথিবীর সমস্ত দেশে কোটী কোটী লোক যখন বেকার, সমস্ত শিল্প পঙ্গুপ্রায় এবং জিনিষপত্রের দাম প্রায় শতকরা ৫০% কম —সে সময় যুদ্ধের আয়োজন এবং অস্ত্রশস্ত্রের জন্য খরচ করা কোন জাতির পক্ষেই আদৌ সম্ভব ও সঙ্গত নয়। অথচ য়ুরোপের সমস্ত দেশের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব না থাকার ফলে সকল দেশকেই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। মিঃ লয়েড জর্জ্জ একথা স্পষ্ট বলেছেন যে জার্ম্মেণী

অনেক সহ্য করেছে এবং ফ্রান্স যদি reasonable না হয় তবে ইংলণ্ড কতকাল বন্ধুত্ব রাখ্‌তে সক্ষম হবে সন্দেহ-জনক। সম্প্রতি মিঃ বলডুইন বলেছেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়লাভ করে তাদেরও সর্ব্বনাশ হয় এবং আবার যদি য়ুরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে "বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার শেষ হবে।" এই সমস্ত উক্তি হতে একথা বেশ ধারণা করা সম্ভব যে য়ুরোপে শান্তি স্থাপনের জন্য এবং তার আদিপর্ব্ব জর্ম্মেণীকে লীগ্‌এ ফিরিয়ে আনবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী হবে না। ফল কি হবে তা বলা শক্ত, তবে কাগজে কলমে একটা নূতন রকমের সন্ধি হবে বলে মনে হয়।

য়ুরোপের যুদ্ধবিগ্রহের আলোচনা এবং এ সব high politics সম্বন্ধে কিছু লেখা অনেকে হয়তঃ অনাবশ্যক মনে করেন। আমি কিন্তু মনে করি যে য়ুরোপের কেন সমস্ত পৃথিবীর বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এমন হয়েছে যে প্রত্যেক দেশের সহিত প্রত্যেক দেশের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বর্ত্তমান জগতের যে কোন দেশেই যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হোক অন্য সমস্ত দেশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়বে। বিগত যুদ্ধে ভারতবর্ষ তো প্রত্যক্ষ ভাবেই জড়িত হয়েছিল। তা'ছাড়া য়ুরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক সমস্যার অনেকটা সমাধান স্বাভাবিক ভাবেই হয়। গত যুদ্ধের সময় যে সমস্ত ঘোষণা করা হয়েছিল এবং আজ তার যা পরিণতি হয়েছে সে কথা চিন্তা করলেই আমি যা বলতে চাই তা পাঠকগণ সম্যক উপলব্ধি করবেন। সুতরাং য়ুরোপের এই অবস্থায় ভারত-বাসীর একবারে উদাসীন থাকার কোন কারণ নেই।

য়ুরোপের নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি আর একটী বিষয়ে দুই একটী কথা বলতে চাই। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস্ দখল করার পর একথা বহুবার বলেছেন যে বৃটিশ পার্লামেণ্ট যাই করুক্ অথবা বৃটিশ জাতি যাই বলুক তাতে কিছুই আসে যায় না, কারণ ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ হবে ভারতে ভারতীয়দের দ্বারা। এই theoryর ফলে লণ্ডনের কংগ্রেস আফিস তুলে দেওয়া হয়েছে এবং য়ুরোপে যে ভারতের পক্ষে propaganda হচ্ছিল তা বন্ধ হয়েছে। আমি য়ুরোপের সমস্ত দেশ ঘুরেছি এবং আমার অভিজ্ঞতার ফলে এই মনে হয়েছে, যে আইনানুগ ভাবে স্বরাজ লাভ করতে হলে একদিকে যেমন ভারতীয় জনমত গঠনের আবশ্যক, তদনুপাতে য়ুরোপের বিশেষতঃ বৃটিশজাতির মত গঠনের আবশ্যকতা খুব আছে। আমাদের দেশীয় স্বাধীনতা ক্রীড় যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাদের শুধু এই কথা বলতে চাই যে "আইনানুগভাবে" অথবা "অহিংস অসহযোগে" স্বরাজ পেতে হলে একমাত্র গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, দ্বারাই সম্ভব। এবং তার অর্থ এই যে বৃটিশ জাতিকে ভারতবর্ষের সম্যক অবস্থা উপলব্ধি করিয়ে তাদের সাহায্য লাভ করতে হবে। স্বীকার করি আর নাই করি—এ ছাড়া আইনানুগ পথ আর নেই। আমার মনে আছে ৺বিপিনচন্দ্র পালের বরিশাল Conferenceএর অভিভাষণ; "Swaraj within the year and in December" একথা আশ্বাস দিয়ে আমাদের দেশের নেতারা ১ কোটী টাকা চাঁদা পর্য্যন্ত তুলেছিলেন। বিপিন বাবুর—"You wanted magic and I gave you logic" এখনও আমার বেশ মনে আছে। দেশের লোক চিন্তা করা ছেড়ে একটা অসম্ভবের পিছনে এমন করে আত্মসমর্পণ করেছে, এর ঠিক তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। Decemberএ স্বরাজের সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার তুলনা করলে ব্যাপারটার monstrous nature হৃদয়ঙ্গম হবে।

যাই হোক্ নিজেদের চেষ্টায় সে ডিসেম্বর মধ্যে স্বরাজ হয়নি এবং যতদূর মানস চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি তাতে ভারতে কোটী কোটী হরিজন উন্নত হওয়ার পূর্ব্বে আধি-ভৌতিক বা আধিদৈবিক স্বরাজ লাভের আশা নেই। আমার মনে হয়—"খুড়ী" করে আমাদের আবার গোড়া পত্তন করার চেষ্টা করা উচিত। সেই চেষ্টার একটা প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত ভারতের জাতীয় মহাসভার পক্ষ থেকে য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষার ২।১টা সংবাদ পত্র প্রকাশ করা। আমাদের সম্বন্ধে য়ুরোপে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে কি ভয়ানক ভুল ধারণা আছে এবং কি প্রকার subtle wayতে আমাদের জাতীয় আদর্শের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয় দুর্ভাগ্যের বিষয় দেশবাসী তা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে না। আমি একথা জোর করে বলতে পারি—যে স্বরাজ লাভের উপায় যত রকমই উদ্ভাবন করা হোক World opinion গঠন করা তার মধ্যে একটী প্রধান উপায় এবং constitutionl উপায়ে স্বরাজ লাভ করতে হলে ইংলণ্ডের জনমত আমাদের পক্ষে

গঠন করা একান্ত দরকার। ইতিপূর্ব্বে স্থানান্তরে আমি কংগ্রেস দখল করার কথা বলেছি। মাদ্রাজে Liberal Federation মিলিত হচ্ছে। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি "Joint action", "united front" প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় কথা এর মধ্যেই বলেছেন এবং যাতে সমস্ত দল মিলে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা মীমাংসা করা সম্ভব তার চেষ্টা হবে। আমার মনে হয় লিবারেল নেতারা একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করে (some definite programme) যদি কার্য্য আরম্ভ করে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার তবে যথেষ্ট উপকার হবে। আমি আমার সাধারণ বুদ্ধিতে যা' বুঝি তাতে প্রোগ্রামটা এই ভাবে হওয়া উচিত—

Liberal Federationএ একটা প্রস্তাব করে'—তাঁরা কংগ্রেসে যোগদান করার কথা স্থির করবেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সমস্ত Liberal নেতারা একসময় কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। মতভেদ হওয়ার দরুণ তাঁরা Federation গঠন করেন। একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে Federationএর উপর দেশের লোকের তেমন আস্থা জন্মে নাই যা' কংগ্রেসের উপর আছে—যদিও গবর্ণমেণ্ট তাদের কথার অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে। বর্ত্তমানে কংগ্রেস একপ্রকার নেই এবং আমি মনে করি এই সুযোগে লিবারেল পার্টি কংগ্রেসে প্রবেশ করে তাকে দখল করা উচিত এবং কংগ্রেসের Right Wing রূপে দেশের জনমত গঠন করে এই বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা থেকে কংগ্রেস ও দেশকে রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত। লিবারেল পার্টির ধনবল, জনবল এবং প্রভাব প্রতিপত্তি যা' আছে যদি তাদের নেতারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে না চলে' দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশের সম্মুখে একটা রাজনৈতিক Programme (as apart from Spinning or Harijan programme or Constructive programme) দিতে পারেন তবে ভারতবর্ষের যথেষ্ট মঙ্গল হবে। আমি এই সুযোগে দেশের অন্যান্য বিভিন্ন দলকেও কংগ্রেসে প্রবেশ করতে অনুরোধ করি। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে যত বড় বড় কথাই বলি না কেন অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের আদর্শ হবে Dominion Status এবং তা' আদায় করতে অনেক তেল, নুন ও লকড়ি খরচ করতে হবে। আমাদের যাত্রা যখন সুরু হয়তো সে পথে—রাজনৈতিক স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন তাঁরা হয়তো ২।৪ মাসে স্বরাজ পেতে পারেন তাঁদের মনে—কিন্তু দেশে স্বরাজ পাওয়ার বিলম্ব আছে। তার জন্য এখনও যথেষ্ট গঠনমূলক কাজ করতে হবে এবং আমি মনে করি আমাদের পুরান কংগ্রেস দল, দেশের জন্য যাঁরা জীবন ভরে কাজ করেছেন তাঁদের উপদেশ, তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের সর্ব্ববিধ সহযোগীতা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক।

লিবারেল পার্টি কংগ্রেসে আসতে হলে বর্ত্তমানে ক্রীড্ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয়তো হবে না এবং হলেও তাতে আবার কার্য্য পদ্ধতিতে বাধা পড়বে না। আমার মনে হয়—Dominion Status বুনিয়াদ করে সমস্ত পার্টির একটা সামঞ্জস্য হতে পারে। হোয়াইট পেপারে লিবারেলরাও সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং compromiseএর basis হওয়া খুব সম্ভব এবং আমার দেশবাসীকে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করতে অনুরোধ করি। আমাদের প্রাচীন নেতা মিঃ জে, এন, বসু এবার Liberal Federationএর সভাপতি হবেন। তাঁকে এই সুদূর থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বিনীত অনুরোধ করছি যে তিনি এই ভাবের constructive কোন Programme Federationএ অনুমোদন করাতে চেষ্টা করুন। তাতেই দেশের মঙ্গল সাধিত হবে।

সংকলন

গৃহ শিল্প

আজকাল "গৃহ-শিল্পের" দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িছে; কারণ এই সব ক্ষুদ্র শিল্পদ্বারা যে গৃহস্থের আর্থিক সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে তাহা আজকাল অনেকেই সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন। এই সম্বন্ধে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয় সাময়িক পত্রিকায় যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে প্রতি বৎসর হাজার হাজার ম্যাট্রিকুলেট, আণ্ডার গ্রাজুয়েট, গ্রাজুয়েট হইতেছেন এবং চাকুরীর বাজারে সকলেই ব্যর্থ হয়া দিয়া বেড়াইতেছেন। হতাশায় জীর্ণ, আত্মসম্মান বোধ-হীন, উন্মত্তপ্রায় বেকার যুবকসম্প্রদায়ের প্রতি চাহিয়া দেখিলে কার হৃদয় না ব্যথায়, লজ্জায় ও সমবেদনায় ভরিয়া উঠে? কারই বা না মনে হয় যে, সমস্ত আন্দোলন দূরে রাখিয়া অন্নচিন্তায় ব্যাকুল জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসা এই যুবক শ্রেণীর হাতে কাজ যাহাতে আসে, তাহার জন্য প্রাণপাত করি?

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন এবং যাঁহারা পাশ করিবার আশায় আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না, সকলেই আকুল হইয়া ভাবিতেছেন, এখন কি করা যায়। আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গালীর ছেলের আর নিরর্থক প্রচলিত পন্থায় আই-এ, বি-এ, এম্-এ ও ল পড়িয়া সময় কাটান কোনমতেই কর্ত্তব্য নয়। যাহাতে কোন শিল্প শিখিয়া শীঘ্র হাতের কাজে রোজগার করা সম্ভব হয়, সেইরূপ শিক্ষার প্রতিই বাঙ্গালী যুবকের মন দেওয়া কর্ত্তব্য।

বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগের উদ্যোগে কয়েক মাস পূর্ব্বে একটী পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে বাংলার যাবতীয় শিল্প ও কলাবিদ্যা শিখাইবার প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সেদিকে বাংলার যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে।

বাংলার ছেলেদের হাতের কাজ শিখাইবার যে সকল ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য, কতকগুলি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ও ফেল ছাত্রদের জন্য এবং আরও কতকগুলি আই-এ, আই-এস্-সি, এবং তাহারও বেশী যাহারা পড়িয়াছে, তাহাদের জন্য প্রধানতঃ নির্দ্দিষ্ট। যে শ্রেণীর শিক্ষার্থীই হউক, একথা মানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, হাতের কাজ করিয়া যাঁহারা রোজগার করিতে চাহেন, তাঁহারা যত অল্প বয়সে কাজে নিয়োজিত হইতে পারেন, ততই মঙ্গল।

শিল্প ও কলকারখানার কাজের মধ্যে এইরূপ ছোট ও বড় চাকুরীর যে সুযোগ রহিয়াছে, তাহার মূলে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা বর্ত্তমান যথা:—কলকব্জার ইঞ্জিনিয়ারী, ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারী ও স্থপতি বিদ্যা। শিল্পজ্ঞানহীন সাধারণ শ্রমিক যেখানে মাসিক গড়ে ১৫৲ টাকা রোজগার করে, সেখানে সামান্য শিল্পের সহিত পরিচিত নিম্নতম শ্রমিক গড়ে মাসিক ২৫৲

হইতে ৩০৲ টাকার কম পায় না। আবার একজন গ্রাজুয়েট সারাদিন পরিশ্রম করিয়া ৩০৲।৩৫৲ টাকার বেশী রোজগার করিতে পারে না; অথচ একটু বুদ্ধি ও কর্ম্ম-কুশলতা যাহাদের রহিয়াছে, সামান্য ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত শিক্ষা থাকিলেও কারখানার কাজে তাহারা অনায়াসে ৬০৲। ৬৫৲ টাকা মাসে পাইতে পারে।

যে সকল যুবক কোন শিক্ষা পাইবার সুযোগ পায় নাই, তাহারা কামারের, ছুতারের এবং তাঁতির কাজে মন দিলে ভাল হয়। চিরপ্রচলিত গ্রাম্য কামার ও ছুতারের এবং তাঁতির কাছে শিক্ষানবিশীর যদি তেমন সুবিধা না হয়, তাহা হইলে কলিকাতা ও তাহার আশে পাশে যে প্রচুর ছোট ও বড় কারখানা রহিয়াছে, তাহাতে ঢুকিয়া অপেক্ষাকৃত নূতন প্রণালীর কাজ শিখিয়া লওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমা কামার, বাসনের কারিকর ও চীনা ছুতারে বাংলাদেশ ছাইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর ছেলেদের কি এই সকল হাতের কাজে তৎপরতা কমিয়া যাইতেছে?

ইহা ছাড়া গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর, বহরমপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, রাজসাহী, বর্দ্ধমান, বিষ্ণুপুর, বরিশাল ও খুলনা সহরে তাঁতের কাজ ও ছোটখাট কলকারখানার কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ছয় মাস হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল উইভিং ও টেক্‌নিক্যাল স্কুলে কাজ করিতে হয় এবং দরিদ্র বালকদের সাহায্যের জন্য অনেক স্থানে সামান্য বৃত্তিরও ব্যবস্থা আছে। আপন কর্ম্মকুশলতা অনুসারে এই সকল স্কুল হইতে শিক্ষা লইয়া যাহারা বাহির হয়, তাহারা অনায়াসে ৫০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা মাসে রোজগার করিতে পারে।

এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে শিল্প ও কারবারের ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে ও যে সকল জিনিসের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে অথবা বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, একটু বিবেচনা করিয়া বালকদের সেই সেই কারবারের সংশ্লিষ্ট কলকারখানার কাজে তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। বর্ত্তমানে মোটরের কল ও লরী ও বাস-গাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের কাজে অনেক বাঙ্গালী ছেলের ভরণপোষণ হইতে পারে এবং মনে হয় শীঘ্রই মফঃস্বলের সহরে ও গ্রামগুলিতে ইলেক্‌ট্রিক্, মোটর ও হস্তপরিচালিত পাম্প, কলের লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষির উপযোগী ছোট বড় কলের, প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যুবকদেরও কিছু হাতের কাজ বাড়িবে। তাহার জন্য এখন হইতে প্রস্তুত হইয়া লওয়া ভাল। এ বিষয়ে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ আশা পোষণ করেন তাঁহারা শিবপুরের কিম্বা যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কিম্বা নব প্রতিষ্ঠিত বালিগঞ্জ কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং এর নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া কিছুদিন শিক্ষালাভ করিলে ভাল হয়।

যাঁহারা কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছেন তাঁহাদের উচ্চতর আশা থাকা স্বাভাবিক। তাহাদের জন্যও উপরোক্ত বিদ্যালয়সমূহে ভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কারখানার হেড মিস্ত্রী, ফোরম্যান, এমন কি ছোট ইঞ্জিনিয়ার পর্য্যন্ত এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার পর কোন ভাল কারখানায় ঢুকিয়া হাতের কাজ শিখিয়া লইতে পারেন। এই সব কাজের জন্য সাধারণতঃ তিন হইতে চারি বৎসর শিক্ষানবিশী করিতে হয়।

স্কুলে ও কলকারখানায় মেকানিক্যাল ও সামান্য ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ শেখা ছাড়া কলিকাতা টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে চামড়ার জিনিষ প্রস্তুত প্রণালী ও অন্যান্য ছোট খাট কারবারের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইশাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরীর সংশ্লিষ্ট টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ও কাঁচড়াপাড়া ও খড়্গপুর রেলওয়ে টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ও টাটানগর টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে নানা শ্রেণীর ছাত্র ও শিক্ষানবিশদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাহিরে বিশেষ আদর হইয়া থাকে, কারণ এই সব কারখানা-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-ভবনে হাতের কাজ শিখাইবার খুব ভাল ব্যবস্থা আছে।

গভর্ণমেণ্ট অথবা রেলওয়ে পরিচালিত এই সব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশে অনেক বে-সরকারী ছোট ও বড় কারখানা আছে, যেখানে বেশ ভালই হাতের কাজ শেখা যায়। তাহার মধ্যে বার্ণ ও বার্ড কোম্পানীর এবং জেসপ্, মার্শাল ও হুকুমচাঁদের কারখানাগুলিই শ্রেষ্ঠ। বেঙ্গল টেলিফোন, কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক্ সাপ্লাই ও অন্যান্য কারখানাতেও অল্প বিস্তর শিক্ষানবিশ গ্রহণ

করার ব্যবস্থা আছে। সেগুলিতে যাহারা প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহাদের ভবিষ্যৎ প্রায়ই খুব ভাল হয়। কয়লার খনির কাজ শিখাইবার জন্যও কয়েকটী স্থানে সুব্যবস্থা রহিয়াছে। বর্ত্তমানে কয়লায় ব্যবসায় খুব মন্দা। তাই অনেকে সেখানে বেকার হইয়া পড়িয়াছেন। তবু এমন সময় আবার আসিবেই যখন কয়লার খনির কাজে পারদর্শী ব্যক্তির আবার আদর হইবে।

কলকারখানার কাজ ছাড়া বাড়ী-ঘর ও রাস্তাঘাট তৈয়ারী এবং মাঠ ও জমি জরিপের কাজ-শিক্ষা করিয়াও অনেক বাঙ্গালী যুবক বেশ রোজগার করিতে পারে। তাহার জন্য শিবপুর ও কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং ময়নামতী, ঢাকা, বর্দ্ধমান, রংপুর, পাবনা ও রাজসাহীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে।

এ সকল ছাড়া সম্প্রতি বেতার ও টেলিগ্রাফের কাজ শিখাইবার জন্য এবং রেলওয়ে কারবার সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলিকাতায় কয়েকটী প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। এগুলি এখনও তেমন ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, তবে উপযুক্ত সময়ে গড়িয়া উঠিবে আশা করা যাইতেছে।

তবে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু কিছু রহিয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-মন্দিরে এবং যাদবপুর কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগে। রসায়ন-বিজ্ঞানে যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি রহিয়াছে, তাঁহারা চাকুরীর বাজারে ঘুরিয়া না মরিয়া যদি এইখানে কিছু শিক্ষা লইয়া সাবান, কালি, পালিশ, বিশুদ্ধ তৈল, মোমবাতি, চিনি প্রভৃতি ছোট বড় জিনিষ তৈয়ারীর দিকে মন দেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হয়। বর্ত্তমানে অনেক বাঙ্গালী যুবক নানা দেশ হইতে বিবিধ শিল্পের সংবাদ ও শিক্ষা লইয়া আসিয়াও উপযুক্ত হাতের কাজ পাইতেছে না। তাহার জন্য কতকাংশে দায়ী আমাদের ধনিকমহল বটে, কিন্তু অধিক ক্ষেত্রেই এই সকল ছাত্রদের ব্যবসায় বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দেখা যায় না। একটু হিসাব করিয়া সস্তায় প্রকৃত ভাল জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারিলে ধনিকদের সাহায্যের অভাব হইবে না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া গতানুগতিকভাবে জীবন কাটানর ব্যবস্থা করার পূর্ব্বে এই সকল নূতন পথের সন্ধান লইতে বাঙ্গালী যুবকমাত্রকেই আমরা অনুরোধ করিতেছি।

জীবনবীমা ও সুদ

সুদের হার বীমা ব্যবসায়ের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। বিশেষতঃ বীমাকারিগণ অনেক সময় বীমা করিয়া টাকা লাগানোর মত সহজ উপায়ে সুদ অর্জ্জন করা যায়না বলিয়া আপত্তি করিয়া থাকে। বিষয়টি জটিল ও জ্ঞাতব্য এবং এ সম্বন্ধে এজেণ্টগণের সুস্পষ্ট জ্ঞান সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। "নবারুণ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ রায়, এম্, এস্, সি মহাশয় এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা এই বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জনের সহায়ক হইবে বলিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বীমা-কোম্পানীর এজেণ্টগণ অনেক সময় দেখিতে পান যে অনেকে জীবনবীমা করিতে চান না, কারণ তাহাদের ধারণা বীমা করিলে টাকাটার কোন সুদ পাওয়া যায় না এবং সুদে অন্যত্র টাকাটা খাটাইলে অনেক বেশী লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। এইরূপ তর্কের উত্তরে প্রধানতঃ দুটি কথা বলিবার আছে। প্রথম, আজকাল অনেক আফিসেই maturityর পর বোনাস্ সমেত শতকরা ৩৲—৪৲ টাকা, এবং ইন্‌কাম্ ট্যাক্স মাপ ধরিলে আরও বেশী লাভ হয়। এবং সুপরিচালিত কোম্পানীগুলির শেয়ারের বাজার দর পরীক্ষা করিলে বোঝা যায়, যে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলির স্থিতিতে সর্ব্বসাধারণের প্রায় সরকারী ঋণের মতই আস্থা রহিয়াছে। সুতরাং বীমা-কোম্পানীতে

টাকা খাটাইয়া যে লাভ হয় তাহার নিরাপদত্ব ধরিলে এবং gilt-edged securityর সুদহার বিবেচনা করিলে একটুও সামান্য নয়। দ্বিতীয়, বীমার সুবিধা এই, প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু ঘটিলে শতকরা কয়েকশত টাকা ফিরিয়া পাওয়া যায়। অন্য যে-কোন উপায়ে টাকা খাটাইলে এই সুবিধাটুকুর সম্ভাবনা নাই। এইটুকু গেল গোড়ার কথা। কিন্তু আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, জীবনবীমার সঙ্গে সুদের কতখানি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—তাহা আলোচনার জন্য। বীমার যে প্রিমিয়ম স্থির করা হয় তাহার হিসাবে সুদও ধরিয়া লওয়া হয়। বীমা বিশেষজ্ঞগণ এইভাবে হিসাব করেন যে এতটাকা করিয়া প্রিমিয়াম পাইলে, শতকরা এতজন লোকের মৃত্যু ঘটিলে এবং পাওয়া টাকাটা এত হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে খাটাইলে কোম্পানী ঠিক বিনাঘাসে দাবী মিটাইয়া যাইতে পারিবে। এই চক্রবৃদ্ধি সুদের মারপাঁচেই সমস্ত বীমা নির্ভর করিতেছে। ধরুণ যদি কেহ প্রতি বছর পাঁচশত টাকা করিয়া জমায় এবং টাকাটা শতকরা ৭৲ টাকা হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে খাটান হয় তাহা হইলে আঠার বৎসর পর যে টাকা জমিবে তাহা হইতে চিরকাল ধরিয়া বছরে পাঁচশত টাকা সুদ পাওয়া যাইবে। এই চক্রবৃদ্ধি সুদের উপর নির্ভর করিয়াই মেয়াদী বীমা বা বার্ষিকবৃত্তি বীমার scheme তৈয়ারী করা হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জমা টাকাটার সুদ অর্জ্জন করিবার ক্ষমতার উপরই বীমা কোম্পানীগুলির সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। এই কথাটি বুঝিতে পারেন না বলিয়াই অনেক বীমাকারী মনে করেন যে প্রিমিয়াম দিতে দেরী হইলে কোম্পানী যে সুদ স্বরূপ কিছু বেশী দাবী করে সেটা বড়ই অন্যায়। যাই হোক্, এখন কথা হইয়াছে যে এই সুদ অর্জ্জন করিবার ক্ষমতা কি সব সময় অক্ষুন্ন থাকে? বীমা কোম্পানীর তহবিলের টাকা সাধারণতঃ অত্যন্ত নিরাপদ জায়গায় এবং বলিতে গেলে সরকারী বা আধাসরকারী ঋণেই অধিকাংশ টাকা খাটান হয়। কিন্তু আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ঋণপত্রের বাজার দরও উঠা-নামা করে অর্থাৎ অন্য কথায় ইহাদের সুদ অর্জ্জন ক্ষমতার তারতম্য হয়। সুতরাং মনে হয় সুদের হারের তারতম্যের উপরই বীমা-কোম্পানীর বোনাস দিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে এবং বর্ত্তমানে এই যে সস্তাটাকার বাজার চলিতেছে এর পর অধিকাংশ কোম্পানীই পূর্ব্বতন হারে বোনাস দিতে পারিবে না। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে ঠিক বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ তা নয়। কারণ সকলেই জানেন বীমা বিশেষজ্ঞগণ ভ্যালুয়েশন (valuation) করিবার সময় হিসাব করেন যে ভবিষ্যতে শতকরা এতটাকা হারে সুদ পাওয়া গেলে, কোম্পানীর খাতায় যে পরিমাণ চলতি বীমাপত্র আছে, তাহার দাবী মিটাইতে তহবিলে ভ্যালুয়েশন (valuation) তারিখে এতটাকা প্রয়োজন। যদি তহবিলে প্রয়োজনীয় টাকা হইতে বেশী থাকে, তবে সেই উদ্বৃত্ত টাকা হইতেই বোনাস দেওয়া হয়। এখন একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে ভবিষ্যৎ সুদের হার ধরিয়া লওয়া হয় তাহা বহুবৎসর ব্যাপক। অর্থাৎ সাময়িক তারতম্য হইলেও যদি ১৲ বা ১৫ বছরের গড়পড়তা হারটা মোটামুটি ঠিক থাকে তাহা হইলে বীমা কোম্পানীর পক্ষে খুব ইতর বিশেষ হয় না। এবং সত্য-সত্যই ঠিক এইরূপ অবস্থাই দাঁড়ায়। সরু সময়েই দেখা যায় যে কয়েক বৎসর ব্যাপী হিসাব করিলে সুদের হারের গড়ে খুব বেশী তফাৎ হয় না এবং বীমা-কোম্পানীগুলির সমৃদ্ধিরও (অন্য কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে)—খুব তারতম্য হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভ্যালুয়েশন করিবার সময় একটা ভবিষ্যৎ সুদের হার ধরিয়া লওয়া হয়। সাধারণ লোকে বীমা করিবার সময় বিবেচনা করেন কোন আফিস কত বোনাস দিল, অনেকে আজকাল এমন কি Reserve ইত্যাদিও দেখিয়া থাকেন। কিন্তু এই সুদের হারের কথাটা খুব কম লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শতকরা ৫৲ কি ৪৷৷ টাকা হারে সুদ হিসাব করিয়া যদি বোনাস দেওয়া হয় তাহা হইলে সে বোনাসের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার প্রভূত কারণ রহিয়াছে। আমার মনে হয় কোন আফিস যদি শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে সুদ ধরিয়া ১০৲ টাকা বছরে বোনাস দিয়া থাকে এবং আর একটি আফিস যদি ৫৲ হারে সুদ হিসাব করিয়া ১৫৲ টাকা বোনাসও দিয়া থাকে তাহা হইলে প্রথমটিই সকলের পছন্দ করা উচিত।

এডেন ও নুন

বর্ত্তমানে এডেন ও বাংলার লবণের ব্যবসায়ের মধ্যে একটা তুলনা মূলক সমালোচনা হইতেছে। এডেনকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা লইয়া এই আলোচনা আরও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। এই সম্বন্ধে "ব্যবসা-বাণিজ্য" পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদের পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থ নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৯০৩-১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সিনর অগ্যাষ্টিনো বুর্গারেলা আজোলা এডেনে প্রথম নুন তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও ব্যবসায় বুদ্ধি বলেই এডেনের লবণ-শিল্প আজ এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এডেনে অন্য কোম্পানী আরম্ভ হইবার সাত আট বৎসর পূর্ব্বেই এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তি অনুসারে কোন লবণ-শিল্পীই এডেনে তাহার প্রস্তুত লবণ বিক্রয় করিতে পারিবে না। কাজেই এডেনের লবণের কারখানা-ওয়ালাদের বাঙ্গালার বাজারের উপরই নির্ভর করিতে হয়।

সিনর বুর্গারেলা ইটালীর লবণের ব্যবসায়িদের সহিত যুক্ত ছিলেন, কাজেই তাঁহার স্থাপিত এডেনের এই কারখানাতে কলিকাতাস্থ বিদেশীয় মহলে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। সকলে মিলিয়া একটা চেষ্টা করিলেন যাহাতে সিনর বুর্গারেলার লবণ বাজারে দাঁড়াইতে না পারে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না। ইহার সাত আট বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডো-এডেন-ওয়ার্কস্ (Indo-Aden-Works) ও অন্যান্য কয়েকটী ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

বর্ত্তমানে এডেনে নিম্নলিখিত চারিটী কোম্পানী কাজ করিতেছে :—

১। এডেন সল্ট্ ওয়ার্কস্
মালিক—অছুস্তিনো বুর্গারেলা এজোলা
জমির পরিমাণ—১,০০০ একর;
নুনের পরিমাণ—১,২৫,০০০ টন বৎসরে,

২। ইণ্ডো-এডেন সল্ট্ ওয়ার্কস্
(Indo-Aden Salt Works)
মালিক—আছল্লাভয় জুমাভয় লালজি
জমির পরিমাণ—৯০০ একর
নুনের পরিমাণ—৭৫,০০০ টন বৎসরে

৩। হাজিভয় সল্ট্ ওয়ার্কস্
(Hajeebhoy Salt Works)
মালিক—হাজিভয় লাল্জি
জমির পরিমাণ—২৪৩ একর
নুনের পরিমাণ—১৫,০০০ টন বৎসরে

৪। লিট্‌ল্ এডেন্ সল্ট্ ওয়ার্কস্
(Little Aden Salt Works)
মালিক—পালনজি এণ্ড ব্রাদার্স
জমির পরিমাণ—১০০ একর
নুনের পরিমাণ—১৫,০০০ টন বৎসরে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে—এই চারিটি কারখানায় মোট উৎপন্ন হইয়াছিল ২,৩০,০০০ টন। বর্ত্তমানে সর্ব্বশুদ্ধ উৎপন্ন নুনের পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ২,৫০,০০০ টন।

এডেনের আবহাওয়াও প্রকৃতপক্ষে লবণ তৈয়ারীর একান্ত উপযোগী। বৃষ্টি প্রায়ই পড়ে না এবং মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে সারা বৎসরই নুন তৈয়ারী করা যায়। এই দিক দিয়া ভারতের অন্যান্য যে সকল নুনের কেন্দ্র আছে, তাহা অপেক্ষা এডেনের এইটী একটী মস্ত সুবিধা। অন্যান্য কেন্দ্রে বৎসরে অন্ততঃ তিন মাস নুন তৈয়ারী বন্ধই রাখিতে হয়। এডেনের বায়বিক তাপ বেশী এবং সর্ব্বত্র প্রায় সমান। ইহা ছাড়া দমকা বাতাস সর্ব্বক্ষণ থাকায় নুনের জল উপিয়া যাওয়াতে (Evaporation) তাহার দানা পাকাইতে খুব সুবিধা হয়। অগভীর (shallow) কতকগুলি পাত্র আছে; সেইগুলিতে হাওয়া কল দিয়া জল জমাইয়া রাখা হয়। বাহিরে সূর্য্যের কিরণে সেই জল হইতে দানা পাকান নুন পাওয়া যায়।

এডেনে নুনের খরচা টন প্রতি ৩৲ টাকার মত; আর কলিকাতায় পাঠাইবার মাশুল টন প্রতি ৫৲ টাকা। কলিকাতা পর্য্যন্ত ষ্টীমারযোগে নুন আসিতে প্রতি ১০০ মণে ৩০৲ টাকার বেশী আসল খরচ পড়ে না।

১৯০৪ সনে যখন এডেন-সল্ট-ওয়ার্কস্ স্থাপিত হয়, তখনই ভারতে একটি নূনের জন্য কোম্পানী গঠনের চেষ্টা হয়। তারপরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যখন ইণ্ডো এডেন ওয়ার্কস্ প্রথম কলিকাতায় নূন চালান দেয়, তখন হয় দ্বিতীয় বার চেষ্টা। উপরোক্ত দুইটি কোম্পানীই লিভারপুল ও হামবার্গের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা স্থাপিত। এবং ইহাদের চেষ্টাই থাকে কলিকাতার বাজার হইতে এডেনের নূনকে সরাইয়া দেওয়া।

কলিকাতার বাজারে নূন সরবরাহ করিবার জন্য সর্ব্বশেষে দলবদ্ধ চেষ্টার সৃষ্টি হয় ১৯২৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী। সল্ট ইম্পোর্টস্ এসোসিয়েসন অব বেঙ্গল নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়; এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে কয়লা সম্পর্কিত ধর্ম্মঘট হওয়ায় লিভারপুলের নূনের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে প্রতি শত মণ নূনের দাম ৬২-৬৫, টাকা থাকে কিন্তু অক্টোবরের দিকে এই দাম দড়িয়া ১২২৲ টাকায় উঠে। অন্যান্য নূনের দরও তদনুপাতে চড়িয়া যায়।

এই সমিতিতে অন্যান্য সভ্যের সহিত ছিল যুরোপীয় নূন আমদানীকারকের মধ্যে এডেনের চারিটী কোম্পানী। বুর্গারেলার প্রতিনিধি ছিলেন গ্র্যাহাম ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড আর অন্যান্য তিনটী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ছিলেন কলিকাতার এ এণ্ড জে লাল্জী। এই সমিতি কর্ত্তৃক দর পরিচালনা করায় কি ফল হইয়াছিল তাহা লবণশিল্প সম্বন্ধে ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্টের ১৩ পৃষ্ঠায় আছে। তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেওয়া হইল :—

ক্রেতাগণকে কত বেশী টাকা দিতে হইয়াছে তাহার অনুমানিক হিসাব।

১৯২৬ (দ্বিতীয়ার্দ্ধ)	২৪,০০,০০০ টাকা
১৯২৭	৬০,০০,০০০ "
১৯২৮	৪২,০০, ০০ "
নোট	১২৬,০০,০০০ "

"মাশুল ভাড়া বৃদ্ধির হিসাব এবং লিভারপুলের লবণ তৈয়ারী খরচা কয়লার ধর্ম্মঘট হেতু বৃদ্ধি পাইয়াছিল—ইহা ধরিয়া লইলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিদেশী লবণ আমদানীকারকগণ কলিকাতার বাজারে লবণের সাধারণ দর অপেক্ষা অন্ততঃ এক কোটি টাকা বেশী পাইয়াছেন।"

এই সময়ে কতকগুলি রুম্যানিয়ান লবণ আসিয়া পড়ে কাজেই লবণের দর প্রতি শত মণে ২৮৲ টাকা করিয়া কমাইতে হইল। ইতি মধ্যে সুদান ও সোমালিল্যাণ্ডে নূতন লবণের কারখানা স্থাপিত হয়। তাহারাও কলিকাতায় মাল চালান দিতে আরম্ভ করেন। কাজেই সমিতি আর উচ্চ দরে লবণ বিক্রয় করিতে পারে নাই এবং ১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাসেই এই সমিতি ভাঙ্গিয়া যায়।

রুম্যানিয়া, পোর্ট সৈয়দ ও লোহিত সাগরের অন্যান্য লবণ তৈয়ারীর কেন্দ্র হইতে যে সকল লবণ আসিতে আরম্ভ করে, তাহার আবার একটা উল্টা ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। লিভারপুলের ও হামবার্গের নূনের আমদানী শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া গেল। এডেনে যাহারা নূন তৈয়ারী করিত, তাহারা তাহাদের সমস্তই নূনই কলিকাতায় চালান দিত; কিন্তু নূনের বাজারে স্পেন, পোর্ট সৈয়দ, মাসোওয়া, ডি জিবুটি, ট্যুনিস্ ও অন্যান্য বন্দরের নূনের আমদানী বেশী হওয়ায় প্রতিযোগিতাও ভয়ানক বাড়িয়া যায়। কাজেই ইহাদিগকেও নূনের দর কমাইয়া দিতে হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে স্পেন দেশীয় করকচ ও অন্যান্য প্রকারের লোহিত সাগরের সস্তা নূণ এত আসিতে থাকে যে এডেনের নূনের কারখানা সমূহের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল। লিভারপুলের নূনের আমদানী শতকরা দশ ভাগ কমিয়া গেল আর হামবার্গের কমিল শতকরা ৪ ভাগ। কলিকাতার নূনের দর শতকরা ৩৮৲ টাকায় নাবিয়া আসিল এবং আরও নাবিবার আশঙ্কা হইতে লাগিল। এই সময়েই করাচী ও ওখার নূন সরবরাহকারীরা রক্ষণ শুল্কের দাবী জানাইল। এই সময়ে কলিকাতায় সর্ব্বসমেত ২৬,০০০ টনের বেশী নূন আমদানী হইত না; এই আমদানী নূনের উপর রক্ষণ শুল্ক হিসাবে মণ প্রতি সাড়ে চারি আনা হারে কর ধার্য্য করা হইল। এই করের বিরুদ্ধে—ব্যবস্থাপরিষদের মনোনীত সভ্য সকলে এবং বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হয় নাই।

যাহা হোক, এই ভাবে কর ধার্য্য করার ফলে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে ইটালীয় বণিকদের পকেটে বার্ষিক প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ও বোম্বাইবাসী কোটিপতি ধনীদের পকেটে বার্ষিক প্রায় দশ লক্ষ করিয়া টাকা দিতে লাগিলেন।

বোম্বাইবাসী বণিকগণকে আবার এডেনের জায়গার জন্য কিছুই দিতে হইত না যেহেতু এডেন ভারতেরই অংশ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে এই টাকাটা বোম্বাইবাসীদের হাতে চলিয়া যাইত, ইহা দিত কাহারা?—বাঙ্গালাই প্রকৃত পক্ষে। রক্ষণ শুল্কের নামে প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা প্রদেশকেই এই সমস্ত টাকার ভার গ্রহণ করিতে হইল।

: ৩ই মার্চ্চ (১৯৩১) এডেনের নূনের দর কলিকাতার বাজারে শত মণ প্রতি ৩৮৲ টাকা হয়। ২০শে মার্চ্চ তারিখেই এই শুল্কের আশঙ্কায় এই দর উঠে ৬২৲।৬৩৲ টাকা। ১৯৩২ সনের শেষ অবধিই এই চড়া দর ছিল।

এখন আবার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই দর নাবিয়াছে কিঞ্চিন্ন্যূন ৫৩৲ টাকায়।

এখন মজা দাঁড়াইয়াছে এই যে, এডেনের শাসনভার ভারত গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে বিলাতী গভর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে এই নূন শিল্পের ৪০ লক্ষ টাকার সুযোগ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। যেই মাত্র শাসন ভার পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, সেই হইতেই মণ প্রতি সাড়ে চারি আনা শুল্ক এডেনের নূন ব্যবসায়ীদিগকে দিতে হইবে।

এই কারণেই ব্যবস্থা পরিষদে বোম্বাইয়ের কোটীপতি স্যার ফিরোজ সেণ্না আবেগময়ী ভাষায় এই হস্তান্তরের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন আর বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা ও জাতীয় পত্রিকা গুলিতে এই হস্তান্তরের বিরুদ্ধে লেখনী চালনার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। এই গেল এক দিক।

এইবার বাংলার লবণ শিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টার বিষয় বলা যাইবে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে লবণ কর স্থাপিত হইলে, শ্রীযুত জে, চৌধুরী এম্-এ, বার্-এট্-ল—১লা বৈশাখ তারিখে এক আবেদন পত্র প্রচার করিয়া বাঙ্গলার লবণ শিল্প পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। এই আবেদন পত্রানুযায়ী কয়েকটি যুবক কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। পরে সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েসন নামে একটী সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির পরমর্শানুযায়ী দুইটি কোম্পানী গঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমটির নাম প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী। এই কোম্পানী দুই বৎসর ধরিয়া নানা প্রকার বিপদাপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া কাঁথির সমুদ্রতীরে দুইটী লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন; এবং বাঙ্গলার বাজারেও উত্তম প্রকারের পরিষ্কার নূন আমদানী করিয়াছেন, এই কোম্পানীর নূন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের স্বদেশী মেলায় প্রদর্শিত হয়। অন্য কোম্পানীর নাম ন্যাশনাল সল্ট কোম্পানী লিমিটেড। কয়েকজন সুদক্ষ কর্ম্মী বাঙ্গালী যুবক দ্বারা এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহারা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাকদ্বীপে কারখানা করিয়াছেন এবং শীঘ্রই নূন সরবরাহ করিতে পারিবেন আশা করা যায়।

শ্রীযুত পি, সি সান্যাল গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইয়া চট্টগ্রামে আরও একটি নূনের কারখানা করিতেছেন।

আরও কয়েক জন বাঙ্গালী যুবক একত্রিত হইয়া ছয়খানি লাইসেন্স লইয়াছেন; তাঁহারা সুন্দরবনের তীরে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি কারখানা স্থাপিত করিতেছেন। এডেন যদি হস্তান্তরিত হইয়া যায়, তাহা হইলে বিদেশী নূনের উপর যে ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহা এডেনের নূনকেও দিতে হইবে। অর্থাৎ বার্ষিক যে ৫,০০,০০০ টন নূন এখানে আমদানী হয়, তন্মধ্যে ৪,৭৫,০০০ টন নূনের উপরই এই কর ধার্য্য করা হইবে। ওদিকে মণ প্রতি সাড়ে চারি আনা কর ধার্য্য করার ফলে বাঙ্গলার নূন শিল্পের সমূহ উপকার হইবে।

ভারতে চিনি

বিদেশী চিনির উপর অধুনা একটা রক্ষণ শুল্ক ধার্য্য হওয়ার পর হইতেই আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ব্যবসা-জীবনে চিনির ব্যবসা একটী অতি প্রকাণ্ড স্থান অধিকার করিবে এবং ইহা দ্বারা বেকার ব্যবসা সমাধানের একটা পন্থা পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই সম্বন্ধে যত আলোচনা হয় জন শিক্ষার পক্ষে ততটাই মঙ্গল।

"উদয়ন" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মৌলিক মহাশয় এ বিষয়ে যে একটী তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে পাঠক-সাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্য দেওয়া গেল।

যুদ্ধের সময় চিনির মূল্য অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় দেশের ইক্ষু-উৎপাদনের ক্ষমতা এবং পরিমাণের দিকে আমাদের ব্যবসায়ী নেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশের কতিপয় ধনীর আগ্রহে দুই-একটি চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই কারখানাগুলি বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কারণ প্রধানতঃ ছিল বিদেশী প্রতিযোগিতা। বোম্বাইএর কারখানাগুলির মধ্যে টাটাদের কারখানাই ছিল বৃহত্তম এবং মিঃ বি, জে, পাদ্শা ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা।

ইহার কিছুকাল পরেই বিদেশী চিনির আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য্য করা হইল। প্রথমতঃ এই শুল্কের উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব-আয়। রাজস্ব-আয় ছাড়া আখের চাষের প্রতি বা চিনির কারখানা স্থাপনের দিকে ভারত সরকার তখনও মনোনিবেশ করেন নাই। আমাদের জাতীয় অর্থ-নৈতিক জীবনে চিনি-শিল্পের যে নানাপ্রকার সুযোগ আছে সে বিষয় ভারত সরকার তখনও গভীরভাবে চিন্তা করেন নাই। প্রথমতঃ, যুদ্ধবিগ্রহের সময় চিনির আমদানী বন্ধ হইয়া গেলে নিত্য প্রয়োজনের জন্য দেশের লোকের চিনি কিংবা গুড়ের অভাবে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হয়; যে পরিমাণ চিনি কিংবা গুড় ভারতে ব্যবহৃত হয়, তাহা যদি দেশেই উৎপন্ন করা যায়, তবে এই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, শস্যের আবর্ত্তনের জন্য আখের চাষ খুব উপযোগী। আখের চাষে জমিতে অধিক পরিমাণে সার দেওয়া এবং জমি গভীর ভাবে চাষ করা দরকার হয়। এই জন্য যে জমিতে একবার আখের চাষ হয় সেই জমিতে পরবর্ত্তী ফসল প্রচুর পরিমাণে হয়। তৃতীয়তঃ, ভারতের চাষীদের ধান, পাট, কিংবা গম ইত্যাদি শস্যের জন্য বিদেশী চাহিদার উপরে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু তাহারা ইক্ষু উৎপাদন করিলে বিদেশী চাহিদার অপেক্ষা করিতে হয় না। সরকারের পক্ষ হইতেও ইক্ষুর চাষ অপেক্ষাকৃত লাভজনক, কারণ চাষীদের হাতে পয়সা আসিলে উপযুক্ত সময়ে তাহারা রাজস্ব দিতে পারে। শুধু এই কারণেও সরকারের ইক্ষুর চাষে উৎসাহ দান করা অনেক পূর্ব্বেই উচিত ছিল। ইক্ষু-ফসলের অন্যান্য সুবিধাও আছে; যথা, ইক্ষুদণ্ডের পরিত্যক্ত অংশগুলি গো, মহিষ ইত্যাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইক্ষু সাধারণতঃ মার্চ্চ হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত জমিতে থাকে। সুতরাং চাষীরা এই সময়টা আখের চাষ করিয়া অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। ভারতবর্ষে আখের চাষে সাধারণতঃ ১ কোটি ৩০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ চাষী ব্যাপৃত আছে। ভারতে যে পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হয়, তাহা চিনিতে রূপান্তরিত করিতে হইলে অন্ততঃ ৫০ হাজার কারখানা-মজুর দরকার হইবে। এবং তাহাতে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইবে তাহাতে অন্যূন ৬০ কোটি টাকা দেশের বার্ষিক আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। গত দুই বৎসরে বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ জমিতে আখের চাষ হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল—

	হাজার	একরে
প্রদেশ	১৯৩১-৩২	১৯৩০-৩১
যুক্ত প্রদেশ	১,৫১৪,০০০	১,৫০৪,০০০
পাঞ্জাব	৪৭৪,০০০	৪২৬,০০২
বিহার-উড়িষ্যা	২৮২,০০০	২৮৪,০০০
বাঙ্গালা	২৩৩,০০০	১৯৯,০০০
মাদ্রাজ	১১৭,০০০	১১২,০০০
বোম্বাই	৯৩,০০০	৯৩,০০০
সীমান্ত প্রদেশ	৪৪,০০০	৪৭,০০০
আসাম	৩৩,০০০	৩৩,০০০
মধ্য প্রদেশ	২২,০০০	২১,০০০
দিল্লী	৩,০০০	৫,০০০
মহীশূর	৩৬,০০০	৩৮,০০০
হায়দ্রাবাদ	৩৫,০০০	৩৪,০০০
বরোদা	২,০০০	১,০০০
মোট	২,৮৮৬,০০০	২,৭৯৭,০০০

উপরোক্ত তালিকা হইতে বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষে আখের চাষের আয়তন নেহাৎ অল্পপরিসর নহে, এবং উপযুক্ত সার ইত্যাদির দ্বারা জমির উর্ব্বরতার উৎকর্ষ সাধন করিলে আমাদের দেশের সম্যক্ চাহিদা পূর্ণ করিবার জন্য যে পরিমাণ চিনি প্রস্তুত করা দরকার, সেই অনুপাতের আখ

জন্মান যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ একাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চিনি ব্যবহার করে। ট্যারিফ্ বোর্ডের রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতবর্ষ বৎসরে ১০ লক্ষ টন্ চিনি ব্যবহার করে এবং ১ লক্ষ টন্ দেশেই প্রস্তুত হয়। জাভা, কিউবা, ফিজি, মরিসাস্, হাওইয়ী ইত্যাদি স্থানে নিজেদের চাহিদার চেয়ে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে তাহার চাহিদা অনুরূপ চিনি প্রস্তুত করিতে পারে, এবং প্রয়োজনের পরিমাণে চিনি উৎপন্ন করিতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। ভারতের মজুরও অপেক্ষাকৃত সস্তা। চিনির কারখানার কাজ যে সময়ে খুব বেগে চলে সেই সময়ে চারিপার্শ্বের কৃষকদের চাষের কাজ একেবারে থাকে না বলিলেই চলে। কাজেই তাহারা ঐ সময়ে খুব অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে সম্মত হইবে।

১৯২১ সন হইতে ভারতে প্রস্তুত চিনির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯২১-২২ সনে ভারতীয় কারখানায় প্রস্তুত চিনির পরিমাণ ছিল ২৮,২৫০ টন। এই সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৮২৯-৩৯ সনে দাঁড়াইয়াছে ৮৯,৮০ টন। ১৯৩০-৩১ সনে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৫,০০০ টন। ১৯৩১-৩২ সনের প্রাথমিক আন্দাজ যদিও ছিল ১৭০,০০০ টন, দ্বিতীয় আন্দাজে হইয়াছিল ২২৮,০০ টন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইবে প্রায় ৩৫১,০০০টনের কাছাকাছি। এই বর্দ্ধিষ্ণু শিল্প বাস্তবিকই দেশের গৌরবস্থল।

এখন দেখা যাইতেছে যে, চিনি-শিল্পই আধুনিক ভারতের শিল্পোন্নতির প্রধান আশ্রয়। বিদেশী চিনির উপরে যে রক্ষণ-শুল্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহা দেশী শিল্পের প্রসারের জন্য প্রভূত সুযোগ প্রদান করিয়াছে। ভারতবর্ষ অনুরূপ সুযোগ অন্য কোন শিল্পের উন্নতির জন্য পায় নাই। মিঃ শ্রীবাস্তব তাঁহার ১৯৩১—৩২ সনের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, দেশীয় চিনি-শিল্পের প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকার যে পদ্ধতিতে শুল্কস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবীরূপে উজ্জ্বল। আমাদের ধারণাও এইরূপ।

মিঃ শ্রীবাস্তব আরও দেখাইয়াছেন যে, চিনির মূল্যের সঙ্গে মোট ব্যবহৃত চিনির পরিমাণের একটা যোগ আছে। কাজেই চিনি-শিল্পের উন্নতির পরিকল্পনায় তাহার মূল্যের বিষয় চিন্তা করা উচিত। নিম্নে যে তালিকা দেওয়া গেল, তাহাতে চিনির মূল্যের এবং ব্যবহৃত পরিমাণের যোগাযোগ কিয়দংশ নির্দ্ধারিত হইবে—

সম্বৎসর	কলিকাতায় জাভা চিনির দর (মণপ্রতি)	ভারতে ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ (টন হিসাবে)
১৯২৩—২৪	১৮৲	৬১৮,০৮১
১৯২৪—২৫	১৪৷০	৮৫৯,০৫৭
১৯২৫—২৬	১০৸৶০	১,০১১,৪৮৮
১৯২৬—২৭	১১৸৶০	৯৯৯,৩০২
১৯২৭—২৮	১০।৶০	১,১০১,৫২৪
১৯২৮—২৯	৯৸/০	১,১৫৪,৮০৫
১৯২৯—৩০	৯৲	১,৩২৪,৯২৩
১৯৩০—৩১	৮৷৶০	১,২১৫,৫৮৫
১৯৩১—৩২	১০/০	১৮২,৫৪০
১৯৩২—৩৩	১০।৶০	৯২৮,৯৫

উপরোক্ত হিসাব হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, ১৯৩০ এবং ১৯৩১ সনে চিনির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম থাকায় মোট ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বৎসর ন্তনগুলি চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা যখন আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই উৎপাদন সুরু করিবে, তখন চিনির দাম কমিই স্বাভাবিক। সুতরাং চিনির চাহিদাও সেই সঙ্গে বাড়িবে, এইরূপ আশা করা যায়।

উত্তর বিহারে এবং যুক্ত প্রদেশে চিনি উৎপাদন অনিয়মিত রূপে বেশী হইতেছে কিনা, এই সম্বন্ধে সিমলা-বৈঠকে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ চাহিদা ও মোট প্রস্তুত চিনির পরিমাণ তুলনা করিলে অপরিমিত উৎপাদনের জন্য ভীত হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

এইখানে ভারতবর্ষের ও জাভার উৎপাদিত ইক্ষুর তারতম্যের আভাষ দেওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রতি একরে ১৩ টন ইক্ষু উৎপাদিত হয়; এইরূপ ১০০ টন ইক্ষু হইতে ৮॥০ টন চিনি প্রস্তুত হয়। জাভাতে প্রতি একরে ৫০ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয় এবং সেখানে ১০০ টন ইক্ষুতে ১২ টন চিনি প্রস্তুত হয়।

ইহাতেও নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই; যেহেতু জাভা অনেককাল হইতে এই আখের চাষের চর্চ্চা করিতেছে। ভারতবর্ষেও চেষ্টা করিলে উৎপাদনের হার বাড়ান যাইবে না, এইরূপ আশঙ্কা করা নিরর্থক।

বাঙ্গালা দেশও এই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করিতে তৎপর হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। বাঙ্গালা দেশে পাটের যুগের আজ প্রায় অবসান হইয়াছে। এই যুগের যখন গোড়াপত্তন হইয়াছিল, বাঙ্গালীরা তখন তাহাতে তাহাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিদেশী মহাজন ও পুঁজিদার আসিয়া পাটের মুনাফা কাড়িয়া লইয়াছে। এবার আসিয়াছে চিনির যুগ। আচিরেই সমগ্র দেশময় মহাজনদের আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংগ্রাম সুরু হইবে। আশা করি এই সংগ্রামে বাঙ্গালী মহাজন, পুঁজিদার এবং ব্যবসায়ী পিছাইয়া পড়িবে না।

সাহিত্যিকা

দেশ বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো

প্রথম খণ্ড। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম, এ, পি, এইচ, ডি, প্রণীত। মূল্য ৩।০ টাকা।

উপরোক্ত পুস্তকে ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যের অভাব আমাদের জাতীয় উদ্বোধনের বিশেষ অন্তরায় একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই কলঙ্ক বিমোচনের জন্য আমাদের সুধীসমাজে যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। আমরা এই বিষয়ে এখনও ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, মার্কিন প্রভৃতি রাষ্ট্রের কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি এই সম্বন্ধে সচরাচরই আক্ষেপ শুনিতে পাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে প্রচলিত করিবার বিরুদ্ধে বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাবের কথাই আমরা বেশী শুনিতে পাই। যাঁহারা এই অভাব দূর করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় করিতেছেন তাঁহারা প্রকৃতই দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছেন এবং মাতৃভাষার হিতাকাঙ্ক্ষীদের তাঁহারা নমস্ত ও কৃতজ্ঞতাভাজন। বিদ্যোৎসাহী গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা বিগত বার বৎসর যাবৎ মাতৃভাষায় এইরূপ বিষয়নিষ্ঠ সাহিত্য প্রণয়ন এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে "হৃষীকেশ সিরিজ" নামক গ্রন্থচক্র প্রকাশিত করিতেছেন। প্রত্যেক বিভাগের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পুস্তকগুলি লিখিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি "হৃষীকেশ সিরিজের" প্রথদশ খণ্ড। ডক্টর লাহা ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, গত রাউণ্ড টেব্‌ল্ কনফারেন্সে যোগ দিবার প্রাক্কালে তাঁহাকে বিভিন্ন দেশীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের গঠন ভঙ্গী সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিতে তিনি ইচ্ছুক হন। গ্রন্থখানি প্রচুর অধ্যয়ন এবং বহুল অভিজ্ঞতার ফল।

প্রথম খণ্ডে মাত্র তিনটি—ফ্রান্স, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও সুইট্‌জারল্যাণ্ড রাষ্ট্রের কাঠামো সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই তিনটি দেশই রিপাব্লিক বা গণতান্ত্রিক, তন্মধ্যে দুইটি ফেডারেল বা যৌথরাষ্ট্র। অথচ এই তিন দেশের কাঠামোই কত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যময়। গণতন্ত্রের যে কোন বিশিষ্ট কিংবা অখণ্ড রূপ নাই, দেশ, কাল, পাত্র ভেদে এবং বিবর্ত্তনের ধারা অনুসারে গণতন্ত্রের বিভিন্ন প্রকারের রূপ সম্ভব তাহা এই পুস্তক পাঠ করিলেই পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এই তিনটী দেশের রাষ্ট্রীয় গঠনের ঐতিহাসিক ভিত্তি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাদের অধুনাতম বিকাশের গতিভঙ্গী স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গণতন্ত্রের ভিত্তি, রাজনৈতিক দল, জনমত, প্রতিনিধি সভা, বিচার ব্যবস্থা, মন্ত্রিসভা ইত্যাদি কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই।

ফরাসী প্রজাতন্ত্রের আলোচনায় গ্রন্থকার ফরাসী বিপ্লবের যুগ হইতে কি ভাবে একাদশবার ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা-বাদের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ফরাসী জনমতের শক্তি, রাষ্ট্রসভা এবং রাজনৈতিক দলের পরস্পর সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ের অত্যন্ত সহজ ও অনবদ্য ভাষায় কথা দেখিতে পাই। আমেরিকার যৌথরাষ্ট্রের পত্তন, কাঠামোর ক্রমবর্দ্ধন, রাষ্ট্রনেতা নির্ব্বাচনের প্রণালী, যৌথতত্ত্ববাদী ও স্বরাজ্যবাদী রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি, রাষ্ট্রীয় গঠনের সামাজিক ভিত্তি, নিগ্রো সমস্যা, যুক্তরাষ্ট্রে জনমতের প্রাধান্য, আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সুইস্ গণতন্ত্রের কাঠামো অন্যান্য যৌথরাষ্ট্রের সহিত কি কি ভাবে তুল্য এবং কি কি বিষয়ে পৃথক তাহার বিশদ আলোচনা আছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিণ প্রভৃতি দেশের মন্ত্রি-সভার সহিত সুইস্ যৌথরাষ্ট্রের মন্ত্রি-সমিতির তুলনা, সামরিক ও অসামরিক ব্যবস্থা, যৌথ-বিচারালয়, যৌথ-বিশ্ববিদ্যালয়, আইন-প্রণয়নে জনগণের চরম কর্ত্তৃত্ব, রাজনৈতিক দল সমূহ, রাষ্ট্রীয় ভাষা ইত্যাদি সকল বিষয়ের যে প্রকার ব্যাখ্যা লেখক করিয়াছেন তাহাতে উপরোক্ত দেশ সমূহের রাষ্ট্রীয় গঠন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার আবশ্যকীয় তথ্যের সন্ধান এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

ডক্টর লাহা এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইলে "দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো" সম্বন্ধে কোন বাঙ্গালীরই আর বিদেশী লেখকগণের সাহায্য লইতে হইবে না এই বিশ্বাস আমাদের আছে। তাঁহার পরিকল্পনা আশু সম্পন্ন হউক ইহাই আমরা কামনা করি।

শ্রীমণি শর্ম্মা

শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী

আমরা বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ বীমা কোম্পানী দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৩৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। এই কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৭১ লক্ষ টাকার উপর এবং উহার সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ প্রায় ১ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা। কোম্পানী অগ্নি, জাহাজ, দুর্ঘটনা, জীবন প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বীমার কাজ করিয়া থাকেন। তবে ইদানীং জীবনবীমার কাজেই কোম্পানী সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এই বৎসর অগ্নি বীমা বিভাগে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর নিকট ৪৪,৩৮,৪৭০ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় উহা ৯,৩৩,৪৯৬ টাকা বেশী। কোম্পানী কর্ত্তৃক এই বৎসরে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত দাবীর পরিমাণ ২৩,৫৬,৭৭৬ টাকা কোম্পানী এই বিভাগে প্রিমিয়াম লব্ধ আয়ের শতকরা ৭৯ ভাগ সঞ্চিত করিয়া ১৭,৬৫,০০০ টাকা মজুদ করিয়াছেন।

জাহাজ বীমা বিভাগে এই বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ মোট ২০,০১,৩৩৪ টাকা আয় হয় এবং কোম্পানীর উপর দাবীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৬৯,০৫৮ টাকা; এই বিভাগে মজুদ তহবিলের পরিমাণ ২৩,৫০,০০০ টাকা অর্থাৎ প্রিমিয়াম লব্ধ আয়ের শতকরা ১৩৫ ভাগ।

দুর্ঘটনা বীমা বিভাগে এই বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর নিকট ৫,১৮,৪৯৬ টাকা আয় হইয়াছে এবং কোম্পানীর উপর ২,৫৭,৭৪৬ টাকা দাবী হইয়াছে এই বিভাগে মোট মজুত তহবিলের পরিমাণ ৪,৫৭,৩৯৯ টাকা অর্থাৎ প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ৮৮·২ ভাগ।

নিউ ইণ্ডিয়ার বয়স বর্ত্তমানে ১৪ বৎসর পূর্ণ হইলেও গত ৪ বৎসর হইল মাত্র কোম্পানী জীবন বীমার কাজ আরম্ভ করিয়াছে এবং চতুর্থ বৎসরেই এক কোটি টাকার উপর পলিসি প্রদান করিয়া ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ৫টী কোম্পানীর অন্যতম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ভারতে জীবন-বীমা ব্যবসায়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে আর কোন কোম্পানী এত অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৫০০৫টি পলিসিতে মোট ১,৩৫,২০,৭০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এই সব পলিসি ফলে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর বৎসরে ৫,৭৯,৯৫৯ টাকা আয় বৃদ্ধি পাইবে। বৎসরের শেষে কোম্পানীতে মোট ৮,৮৭৮ পলিসিতে ২,১৯,৫৭,৫২৭ টাকার বীমা চলতি ছিল।

এই বৎসর কোম্পানীর ৩৮ জন পলিসি গ্রাহকের মৃত্যু হওয়াও কোম্পানীর উপর মোট ১,২৬,০০০ টাকা দাবী হইয়াছে।

বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪১,৪২৩ টাকা। বৎসরের শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮,৭৭,৫৫২ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

জীবন বীমার কার্য্য সংগ্রহ ব্যাপারে নিউ ইণ্ডিয়ার কলিকাতা আফিস স্থাপনাবধিই যে সাফল্য দেখাইতেছে তাহার সমগ্র কৃতিত্ব ইহার কলিকাতা শাখার লাইফ ম্যানেজার ডাঃ এস্, সি, রায়ের প্রাপ্য। ডাক্তার রায়ের অদ্ভুত সংগঠন ক্ষমতায় এই কোম্পানীর যে কর্ম্মীদল গঠিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা যে-কোন ভারতীয় কোম্পানীর গৌরবের কথা। আমরা ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে এই কোম্পানীর আরও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। কোম্পানীর সাধারণ বীমা বিভাগের ম্যানেজার মিঃ ওয়াই, আর, গ্যাটেল বরদে ইরাণ হইলে তাঁহার কার্য্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা আশা করি এইরূপ দুইজন উপযুক্ত কর্ম্মীর সমবায়ে নিউ ইণ্ডিয়া ভারতের বৃহত্তম কোম্পানীর সমপদস্থ গৌরব অর্জ্জন করিবে।

নিউ বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী

আজকাল এই দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলি যে ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে তাহা এক দিকে যেমন আশঙ্কার কথা অন্য দিকে তেমনিই আশার কথা সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে প্রভিডেণ্ট কোম্পানী অনেকগুলিই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের স্থায়ীত্ব কতটা সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার সময় এখনো আসে নাই। কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কার্য্য পরিচালনা করিলে যে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলি জনসাধারণের সম্যক্ সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করিতে পারে, ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্টের বিপুল সাফল্যই তাহার প্রমাণ। যাহা হউক "ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্টের" আদর্শে ও কর্ম্ম প্রণালী গ্রহণ করিয়া যে কয়টী নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে "নিউ বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স" এদেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বনামপ্রসিদ্ধ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও আরও কয়েকজন কর্ম্মী এবং ব্যবসায়ীরা এই কোম্পানীর পরিচালক।

এই কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণভাবেই বীমা-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী চালান হয়। বিনা ডাক্তারী পরীক্ষায় যার তার বীমা গ্রহণ করা হয় না, এবং গঙ্গাযাত্রী বৃদ্ধের বীমাও গ্রহণ করা হয় না। কাজেই কোম্পানী যে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণের ক্ষতি করিবে,—তেমন সম্ভাবনা নাই। এই কোম্পানী সম্পূর্ণই নিরাপদ।

এই কোম্পানীর কর্ম্মিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন দাস বীমাকর্ম্মীরূপে যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা এই প্রভিডেণ্ট কোম্পানী গঠনের পক্ষে যে যথেষ্ট অনুকূল হইবে ইহা আমরা আশা করি। আমরা এই কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাংলার শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য জগতে যে একটা গঠনের যুগ আরম্ভ হইয়াছিল তাহারই মধ্য মুহূর্ত্তে জন্ম হয় বেঙ্গল মার্কেণ্টাইলের। কতিপয় সুপরিচিত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এই কোম্পানীটির গোড়াপত্তন করেন। যে কোন কারনেই হউক গত পাঁচ বৎসর যাবৎ এই কোম্পানীর অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইতে থাকে। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় কোম্পানী যখন মৃতপ্রায় তখন সন্দেহ হইয়াছিল বুঝি বা বাঙ্গালীর ব্যবসা-জগতে আর একটা দুর্ব্বিপাক ঘনাইতেছে। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতির কথা তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মনে চির জাগরুক থাকিয়া বাঙ্গালী ব্যবসার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ সংস্কার গঠিত করিয়াছিল। বেঙ্গল মার্কেণ্টাইলের এইরূপ মৃতপ্রায় অবস্থায় ইউনিক এ্যাস্যুরেন্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব চিফ অর্গানাইজার ও ডিরেক্টর কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মুখার্জ্জী মহাশয় সমূহ বিপদ বুঝিয়াও এই কোম্পানীর জীর্ণ পঞ্জরে প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্য ইহার বোঝা ঘাড়ে পাতিয়া লইলেন। চিন্তাহরণ বাবু ১৯৩২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইহার ম্যানেজিং এজেন্সির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ইহার ব্যবসার দায়ীত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার হাতে আসিবার পরক্ষণ হইতেই কোম্পানীর সমস্ত পুঞ্জীভূত ক্লেদ সরাইয়া ইহাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। এই সংস্কার কাজের প্রথম এবং প্রধান কার্য্য হইল ইহার ডিরেক্টর বোর্ড পুনর্গঠন করা। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে অধ্যাপক নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগ্যকুলের শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল রায়, অবসর প্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনেরাল রায় যোগেশ চন্দ্র বানার্জ্জী বাহাদুর, অবসর প্রাপ্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় ভুবনমোহন গাঙ্গুলী বাহাদুর এবং অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত রসিকমোহন ভট্টাচার্য্য প্রমুখ জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ সুধীমণ্ডলী ও তরুণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই কোম্পানীর পরিচালক সংঘে যোগদান করিয়া ইহার সাফল্যবিধান করিতেছেন। ডিরেক্টর বোর্ড সংগঠনে চিন্তাহরণ বাবুর যে তীক্ষ্ণ ব্যবসা-বুদ্ধি পরিস্ফুট হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। সুখের বিষয় দ্বারবঙ্গের মহারাজ কুমার বাহাদুর ও মন্তোষের রাজা অন্নারেব্‌ল্ স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক হইতে রাজী হইয়া কোম্পানীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কোম্পানীর ১৯৩৩ সনের ৩০শে জুন বর্ষশেষের কর্ম্মবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ২,৮০, ৭৫০৲ টাকার বীমার আবেদন পত্র পাইয়াছিল এবং সর্ব্বসাকুল্যে ২,২২,৭৫০৲ টাকার বীমাপত্র ইস্যু করিয়াছিল। পূর্ব্ব

কলিকাতা
কলেজ অফ্ ইন্সিওরেন্স

বিখ্যাত বীমাবিশেষজ্ঞগণের শিক্ষাধীনে M. I. E. S. ও F. I. E. S. ডিগ্রীর জন্য শিক্ষাদান করা হয়। নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্যতথ্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
কলিকাতা কলেজ অফ্ ইন্সিওরেন্স
৪১।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।